বড়দের বয়ান

মজলিসে দাওয়াতুল হক কী ও কেন?

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

২৬শে জানুয়ারি ২০১৬ ইং, বুধবার রংপুর জুম্মাপাড়া মাদরাসায় দাওয়াতুল হকের মহাসম্মেলনে হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত, মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ফিকিরের সারনির্যাস মজলিসে দাওয়াতুল হকের পরিচয়, প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান।

হামদ ও সালাতের পর...

উপস্থিত বাংলাদেশ মজলিসে দাওয়াতুল হকের আমীরুল উমারা, মুহিউস সুন্নাহ, শাইখুল হাদীস আল্লামা মাহমুদুল হাসান দামাত বারাকাতুহুম; আমার শাইখ, সায়্যিদ, হাফেয, কারী, মুকুরী, মাওলানা শাহ আবরারুল হক নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু-এর খলীফাবৃন্দ; ওয়াজিবুল ইহতেরাম, ওয়ারিসে আম্বিয়া সর্বস্তরের উলামা হাযারাত; কাবেলে ইহতেরাম, আশেক সুন্নাত দীনদার ভাইয়েরা ও সুন্নাতের ধারক-বাহক, প্রাণপ্রিয় তালিবানে ইলম।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী, তিনি আমাদেরকে কঠিন শৈত্য প্রবাহ উপেক্ষা করে জুম্মাপাড়ার এই দাওরায়ে হাদীস মাদরাসায় দাওয়াতুল হকের মহাসম্মেলনে সুন্নাতের নামের উপর উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ, এই মজলিস হাশরের ময়দানে নবীজীর প্রতি আমাদের অন্তরের ইশ্‌ক ও মহব্বতের সাক্ষী হবে। নচেৎ দূর-দূরান্ত হতে যাতায়াত ও খানা-পিনার কষ্ট স্বীকার করে আমরা এখানে আসতে পারতাম না। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিয়েছেন, তার হাবীবের মুহাব্বত অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন এ জন্য আমাদের পক্ষে সম্মেলনে আসা সহজ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মাহফিলকে ভরপুর কবুল করুন। এর উসিলায় আমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে মাফ করে সকলের হিদায়াতের ফয়সালা করুন।

আমি আপনাদের সামনে দু'টি আয়াতে কারীমা ও দু'টি হাদীস শরীফ তিলাওয়াত করেছি।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা (সূরা হাশর- ৭)

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ : হে নবী! মানুষকে বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান- ৩১)

হাদীস শরীফে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء

অর্থ : ইসলাম তার অভিযাত্রা শুরু করেছে অপরিচিত অবস্থায়। শীঘ্রই তা শুরুর অবস্থায় ফিরে যাবে। তবে গোরাবাদের (অপরিচিত মুসাফির) জন্য সুসংবাদ! যারা আমার ইন্তিকালের পর আমার সুন্নাতের মধ্য হতে মানবসৃষ্ট বিচ্যুতি ও বিকৃতি সংশোধন করে দিবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৮৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬২৯, ২৬৩০)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ... الخ

অর্থ : আমার ইন্তিকালের পর তোমরা যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সে সময় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার তরীকাকে আঁকড়ে ধরা এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের তরীকাকে মজবুত করে ধরা। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৬০৭)

মুহতারাম উপস্থিতি! এ মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য একটি বিশেষ মেহনত সম্পর্কে আলোচনা করা। তা হল, মজলিসে দাওয়াতুল হকের কাজ কীভাবে শুরু হল? এবং কীভাবে আমরা এই মহান কাজ লাভ করলাম?

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ তথা দীনী সংস্কারক ছিলেন। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন। বলাবাহুল্য, মুজাদ্দিদ প্রেরণ করা নবী প্রেরণের মতো নয়। অর্থাৎ (আল্লাহর পানাহ,) মুজাদ্দিদের কাছে ওহী আসে না। ওহীর দরজা তো কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। বরং এর অর্থ হল, উম্মতের ব্যাপক ফায়দার জন্য উম্মতেরই কোন বড় আলেমকে আল্লাহ তা'আলা মুজাদ্দিদ বানিয়ে দেন যা তার সংস্কারমূলক কাজকর্ম দেখে অনুধাবন করা যায়। সাধারণ উলামায়ে কেরাম তো মাশাআল্লাহ উম্মতের অনেক ভুল-ভ্রান্তিই ঠিক করে দেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে উম্মতের মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয় যেদিকে সাধারণ আলেমদের দৃষ্টি যায় না। এর হেকমত ও রহস্য আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তো ঐ ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীতে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক পাঠান।

আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে আছে,

إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যিনি তাদের প্রয়োজনীয় দীনী সংস্কার সাধন করেন। (সুনানে আবূ দাউদ: হা.নং ৪২৯১)

মুজাদ্দিদগণ সাধারণত দুই ধরণের সংস্কার কাজ আঞ্জাম দেন।

(ক) দীনের নামে অনেক গলদ বিষয় দীনের মধ্যে প্রবেশ করে। মুজাদ্দিদগণ এগুলোকে স্পষ্ট করে দীন থেকে ছাঁটাই করে দেন। যেমন, ১. উরস শরীফ ২. জশ্‌নে জুলুস ৩. মীলাদ-কিয়াম ৪. ঈদে

মীলাদুন্নবী। ৫. অনুরূপভাবে কিছু বদনসীব লোকের নবীদের ভুল ধরা ৬. সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে না করা, তাদের সমালোচনা করা বৈধ মনে করা ৭. ভণ্ড নবীর অনুসরণ করা ৮. মাযহাব মানার দরকার নেই; বুখারী শরীফ বগলে রাখলেই দীনের ওপর চলা যাবে এ জাতীয় কথাবার্তা প্রচার করে দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মূলত দীন বহির্ভূত; কিন্তু দীনের নামে উম্মতের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। মুজাদ্দিদগণ এ ধরনের ভুলগুলো চিহ্নিত করে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সমূলে মিটিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, সহীহ বুখারীর দোহাই দিয়ে মাযহাব অস্বীকার করার বিষয়টি কেন ভুল তা বুঝার জন্য একটু ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

সহীহ বুখারীতে এমন অনেক হাদীস আছে যেগুলো রহিত হয়ে গেছে। যেমন, ১. সহীহ বুখারীর এক হাদীসে যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ তারিখে রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৯৬) আবার পরবর্তী এক হাদীসে তা হারাম বলা হয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৯৭, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৪১৮, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ২৮৮৮)

২. এক হাদীসে আছে, তোমার ইমাম যদি বসে নামায পড়ায়, হে মুক্তাদী! তুমিও বসে বসে ইকতেদা করো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭২২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪১৭) কিন্তু এই বিধান নবীজীর অন্তিম মুহূর্তে বসে বসে ইমামতি করা আর সাহাবাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করার দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১৪)

৩. ইসলামের শুরুর দিকে নামাযে বারবার হাত তোলার হুকুম ছিল। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৩৬) কিন্তু যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন সেই তিনিই আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর নামাযে একবারের বেশি হাত উঠাতে নিষেধ করেছেন। (আখবারুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন লিলকাইরাওয়ানী) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর বড় মাপের শাগরেদ, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত মুজাহিদ, হযরত আব্দুল আযীয ইবনে হাকিম, হযরত আবুল আলিয়া রহ. প্রমুখ বলেছেন, আমরা আমাদের উস্তাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের পিছনে কয়েক বছর নামায পড়েছি কিন্তু তাঁকে নামাযে একবারের বেশি হাত উঠাতে দেখিনি। (শরহু মাআনিল আসার; হা.নং ১৩২৩, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ; হা.নং ১০৮) কাজেই পরবর্তী দুই হাদীস জানার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে নামাযে কয়েকবার হাত উঠানোর হাদীস বর্ণনা করা কোন অবস্থায় ঠিক হতে পারে না। কারণ এ হাদীসটি মক্কী যিন্দেগীতে থাকা কালীন তিনি বলেছিলেন। এ জাতীয় অনেক রহিত হাদীস সহীহ বুখারীতে আছে।

৪. স্ত্রীর সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন হয়েছে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি, চারও মাযহাব মোতাবেক এদের উভয়ের ওপর গোসল ফরয হবে, যা সহীহ বুখারীর ২৯১নং হাদীসে উল্লেখ আছে। অথচ বুখারী শরীফের দু-দুটি স্থানে আছে, এদের ওপর গোসল ফরজ হবে না, শুধু উযূ করে নিলেই হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৯২, ২৯৩) পূর্বের হাদীস দ্বারা পরের হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

মোটকথা, এ জাতীয় বিষয়গুলো এক যামানায় ছিলো, পরবর্তীতে ঐ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কারণ দীনে ইসলাম একদিনে বা একবারেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়নি; ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে তা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। ফলে অনেক পুরাতন হুকুম নতুন হুকুম দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। হাদীসের কিতাবের লেখকগণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংরক্ষণের স্বার্থে নতুন-পুরাতন, আগের পরের সকল বিধান সংবলিত হাদীস কিতাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীসে থাকলেই এবং বর্ণনাসূত্র সহীহ হলেই সর্বক্ষেত্রে তার ওপর আমল করা যায় না। বরং হাদীসে বর্ণিত বিধানটি নবীজীর সাথে খাস ছিল কিনা? বা উম্মতের জন্য বলে থাকলেও নবীজীর ইন্তিকাল পর্যন্ত তা বহাল ছিল কিনা তা-ও দেখতে হয়। বোঝা গেল, যে হুকুমটি নবীজীর সাথে খাস বা যে হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে, বর্ণনাসূত্র সন্দেহাতীত হওয়ার কারণে সেটা সহীহ হাদীস একথা ঠিক এবং তা ইসলামের সঠিক ইতিহাসও বটে; কিন্তু সুন্নাত অর্থাৎ আমলযোগ্য নয় কিছুতেই। বরং এসব হাদীসের উপর আমল করা উম্মতের জন্য নাজায়েয বটে।

উদাহরণত একই সময়ে নিজের বিবাহে চারের অধিক স্ত্রী রাখা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। একথার বর্ণনা কুরআনে কারীমেও এসেছে এবং নবীজীর সীরাত সংরক্ষণের বৃহত্তর স্বার্থে হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারীতেও এসেছে কিন্তু এটাকে সুন্নাত মনে করে কোন মুসলমান এর ওপর আমল করতে পারবে না। কেননা এ বিধান নবীজীর সঙ্গে নির্দিষ্ট। নবীজী ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য একই সময়ে নিজের অধীনে চারের অধিক স্ত্রী রাখা জায়িয নেই। সুতরাং যারা বলে বুখারী শরীফ বগলে রাখলে মাযহাব মানার দারকার নাই; তাদেরকে বলা হবে, তাহলে তোমরাও একই সময়ে ৯টি বা ১১টি করে বিয়ে করো। কারণ একই সময়ে নবীজী কর্তৃক ৯ জন বা ১১ জন স্ত্রী রাখার কথা তো সহীহ হাদীসেই আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৮৪) আর তোমরা তো হাদীস মানারই দাবী করে থাকো। বলুন, এ হাদীসের ওপর আমল করা তাদের জন্য জায়িয হবে? হবে না। কারণ এটা হাদীস সত্য; কিন্তু সুন্নাত নয়।

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর কোথাও একথা বলেননি যে, তোমরা আমার এই কিতাব বগলে নিয়ে ঘুরতে থাকো, তোমাদের আর মাযহাব মানা লাগবে না। বরং স্বয়ং ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযীসহ বড় বড় সকল মুহাদ্দিস এবং বড় বড় সকল মুফাসসির সারা জীবন কোন না কোন মাযহাব মেনে চলতেন। কেউ হানাফী মাযহাব, কেউ শাফেয়ী মাযহাব, কেউ হাম্বলী মাযহাব আবার কেউ মালেকী মাযহাব অনুসরণ করতেন। মাযহাব অনুসরণকারী মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরদের একটি বিরাট তালিকা আমি আমার লিখিত কিতাব 'মাযহাব ও তাকলীদ'-এর মধ্যে পেশ করেছি। মাযহাব মানা যদি শিরক হয় তাহলে হে লা-মাযহাবীরা! মাযহাবওয়ালাদের সংকলিত কিতাব দিয়ে তোমরা হাদীসের দলীল পেশ করছো কীভাবে? কারণ মাযহাব মানার কারণে তোমাদের মতে তারা তো মুসলমানই নয়। (নাউযুবিল্লাহ) বেয়াদবিরও একটা সীমা থাকা দরকার।

আরেকটি কথা বুঝুন। হাদীসকে সহীহ-যঈফ হিসাবে মাপা হয় মিশকাত জামাতের কিতাব 'নুখবাতুল ফিকার', উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগের কিতাব 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ্' দ্বারা। যারা এসব কিতাব লিখেছেন তারাও কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবী ভাইদের বক্তব্য অনুযায়ী মাযহাব অনুসরণের কারণে তারা তো বেঈমান, তাহলে তোমরা তাদের কিতাব দিয়ে সহীহ-

যঈফ নির্ণয় করছো কিভাবে? আসল কথা হল, মাযহাব অনুসারীরা বেঈমান নয়, তোমরাই বরং নিজেদের ঈমানের খোঁজ নিয়ে দেখো। আর এদের কিতাব বাদ দিয়ে সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করো যে, সহীহ হাদীস কাকে বলে? যঈফ হাদীস কাকে বলে? তোমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হল।

শরীয়তের হুকুম আহকাম বর্ণনার জন্য ছয় ধরণের কিতাব প্রয়োজন: তাফসীরের কিতাব, উসূলে তাফসীরের কিতাব, হাদীসের কিতাব, উসূলে হাদীসের কিতাব, ফিকহের কিতাব, উসূলে ফিকহের কিতাব। আমরা মাযহাবওয়ালারা আমাদের লেখা এই ছয় ধরনের কিতাবই দেখাতে পারব। কোন লা-মাযহাবী বন্ধু কী দেখাতে পারবে এ ছয় বিষয়ের উপর তাদের লেখা কোন কিতাব? পারবে কিভাবে! তাদের জন্ম তো বৃটিশ বেনিয়াদের যামানায়। আর এই কিতাবগুলো লেখা হয়েছে ১২/১৩ শত বছর আগে। ১২/১৩ শত বছর আগে তো আর ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, দর্জি, সুইপার নামে আহলে হাদীসের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই তারা দেখাবে কোত্থেকে? বর্তমানের আহলে হাদীসরা তো মেড ইন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ঠিক যেমনিভাবে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী বৃটিশের কারখানায় প্রস্তুতকৃত (ভণ্ড) নবী'!

তো একজন মুজাদ্দিদ এ সকল বদ্‌দীনী বিষয়াদিকে চিহ্নিত করে দীন থেকে খারিজ করে দেন।

(খ) মুজাদ্দিদদের দ্বিতীয় দায়িত্ব : দীনের অনেক জরুরী বিষয় দীন থেকে বাদ পড়ে যায় সেগুলোকে মুজাদ্দিদগণ পুনরায় দীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেন। যেমন,

১. মুর্দাকে কবরে ডান কাতে শোয়ানো সুন্নাত। (সুনানে আবী দাউদ; হা.নং ২৮৭৫) কিন্তু আমরা চিৎ করে শোয়াই। তারপর ঘাড় বাঁকা করে শুধু চেহারাটা কিবলার দিকে করে দেই। এটা কি সুন্নাত তরীকা? সুন্নাত তরীকা হল মাইয়িতের সীনাসহ পুরো শরীর কিবলার দিকে করে রাখতে হবে। শরীর চিৎ করে রেখে শুধু চেহারা কিবলামুখী করলে যথেষ্ট হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/২৩৫, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৮৭৫, মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ১৩০৫)

২. আমরা মাইয়িতের দাফনে অযথা বিলম্ব করি। এটা জায়েয, না নাজায়েয? হাদীসের কিতাব খুলে দেখুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (অর্থ) কোন মুসলমানের লাশ তার পরিবারের মধ্যে আটকে রাখা (অর্থাৎ দাফনে বিলম্ব করা) উচিত নয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩১৫৯) অথচ ছেলে দেখবে, জামাই-মেয়ে লন্ডন থেকে আসবে, সারাদেশের মানুষ জানাযায় শরীক হবে ইত্যাদি অজুহাতে আমরা এটা নির্দ্বিধায় করে যাই এবং দাফনে বিলম্ব করি।

৩. মুর্দার জন্য সওয়াব রেসানি টাকা বা বিনিময় ছাড়া হতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৪১)

৪. খতম তারাবীহ বিনিময় ছাড়া হতে হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ১৯৪৪৪)

অনেকে রমযান মাস আসলে হাফেয সাহেবদের প্রতি খুব দরদী হয়ে ওঠে; তারা প্রশ্ন করে, টাকা না নিলে হাফেযরা খাবে কোত্থেকে? অথচ বাকি এগারো মাস হাফেয সাহেবদের কোন খোঁজ-খবর নেয় না। নিয়ম তো ছিল, হাফেয সাহেবগণ দুনিয়াবী পড়াশোনা ও আরাম-আয়েশকে উপেক্ষা করে নিজের সীনায় কুরআনে কারীমের দৌলত অর্জন করেছে ফলে আল্লাহর কাছে তাদের মূল্য ও মূল্যায়ন কল্পনাতীত–এই কারণে তাদেরকে সম্মান করা, মুহাব্বত করা এবং উক্ত মুহাব্বতের ভিত্তিতে সারা বছর তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, যথাসাধ্য হাদিয়া-তোহফা ইত্যাদি পেশ করা। হাফেয সাহেবকে মুহাব্বত করার এটা বৈধ পন্থা। কিন্তু তা না করে শুধু রমযানের এক মাসই হাফেযদের প্রতি দরদ দেখায় এবং খতমে তারাবীহর বিনিময় নাজায়েয পয়সা তুলে হাফেযদেরকে দেয়।

হে হাফেয সাহেব! তোমার সিনায় ৩০ পারা কুরআন তো তোমার বাবা রাখেনি, তুমিও রাখনি; বরং আমি মাওলায়ে কারীম নিজে রেখেছি। (সূরা কিয়ামাহ- ১৭) হে হাফেযে কুরআন! তুমি সওয়াবের আশায় মানুষকে কুরআন শুনিয়ে যাও। আমি তোমার জন্য ইজ্জতের রিযিকের ব্যবস্থা করব। আমি ১১ মাস তোমাকে খাওয়াই আর এক মাস খাওয়াতে পারব না! আমার ওপর আস্থা রাখো, তোমাকে দুনিয়াদারদের সামনে বেইজ্জত করব না। কারণ 'আমি তোমাকে কুরআনের নিয়ামত এজন্য দেইনি যে, তুমি কষ্ট করবে।' (সূরা ত্ব-হা- ২)

৫. কারো মৃত্যু হলে যতদূর সম্ভব সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ফারায়েয বের করে প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরী বিষয়। (সূরা নিসা- ১০) কিন্তু আমাদের দেশে কি এটা হয়? হয় না। এটা সঠিকভাবে না হওয়ার কারণে একজনের হক অন্যজন মেরে খায়। আরও মারাত্মক কথা, মাইয়িতের নাবালেগ সন্তান থাকলে সেই ইয়াতীমের সম্পদ তার মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আলেম-উলামাদেরও খাওয়া হয়ে যায়, যা দোযখের আগুন খাওয়ার সমতুল্য। আল্লাহ হিফাযত করেন।

এ জাতীয় অগণিত ভুল আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। মুজাদ্দিদের দ্বিতীয় কাজ হল, এ ভুলগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া; কিতাবের পৃষ্ঠা খুলে খুলে দেখানো যে, দেখো কিতাবে কী আছে আর আমাদের সমাজ কীভাবে চলছে আর আমাদের আমলে কী আছে? তো এই বিষয়গুলো হাতেকলমে ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করাই হল মুজাদ্দিদের আসল কাজ।

এই উম্মতের প্রথম মুজাদ্দিদ ছিলেন হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. আর শেষ মুজাদ্দিদ হবেন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহির রিযওয়ান। এর মাঝে প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'আলা পাঠাবেন।

গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে যাদের কাছে লেখা-পড়া করেছেন তারা তার কর্মজীবন দেখে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আমাদের এই ছাত্রকে আল্লাহ তা'আলা মুজাদ্দিদ হিসেবে কবুল করেছেন।

আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ছিলেন ঐ যামানার অনেক বড় আলেম, দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস। আমরা বুখারী শরীফের সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে তার নামও বলি। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে বহু বছর বুখারী শরীফ পড়িয়েছেন। আল্লামা কাশ্মীরী রহ. দেওবন্দ থেকে ডাবেল মাদরাসায় চলে যাওয়ার পর থেকে হযরত মাদানী রহ. দেওবন্দ মাদরাসায় বুখারী শরীফ পড়াতেন। তাকে এক মজলিসে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, লোকেরা মাওলানা আশরাফ আলী থানবীকে 'যামানার মুজাদ্দিদ' বলে, আপনি এ ব্যাপারে কী

বলেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইসমে কেয়া শ্যক হ্যায়!' অর্থাৎ মাওলানা আশরাফ আলী এই যামানার মুজাদ্দিদ, এতে সন্দেহের কী আছে!

হযরত থানবী রহ. প্রায় হাজার খানেক কিতাব লিখে গেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের কুতুবখানায় সেগুলো সংরক্ষিত আছে। তিনি কানপুর মাদরাসায় অনেক বছর ইলমী খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। বহু এলাকায় দীনী মাহফিল করেছেন। সে সব বয়ান আজও সংরক্ষিত আছে। শেষ জীবনে তিনি থানাভবনের খানকা থেকে বহু কর্মবীর আলেমে দীন তৈরী করে গেছেন। তার বাংলাদেশী শাগরেদদের মধ্যে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা হাফেজ্জী হুযূর, মাওলানা পীরজী হুযূর, মাওলানা আতহার আলী সিলেটী, মাওলানা কুব্বাদ আলী নোয়াখালী, মাওলানা মাকসূদুল্লাহ বরিশালী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব (মুহতামিম, হাটহাজারী) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অন্যতম। তার এসকল শাগরেদ অগণিত মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে, তাবলীগ জামাআতের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং আরও বিভিন্ন উপায়ে দাওয়াত ইলাল্লাহর প্রায় সকল ময়দানে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। অন্যকথায় হযরত থানবীর দরবার থেকে আসার পর তারা একেকজন একেক এলাকার জন্য হেদায়াতের নক্ষত্র হয়ে গেছেন।

মোটকথা, হযরত থানবী রহ. দীনের চতুর্মুখী কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ফিকিরের সার-নির্যাস হল, 'মজলিসে দাওয়াতুল হক'।

তিনি মাদরাসায় পড়িয়েছেন, খানকায় আত্মশুদ্ধি করিয়েছেন, হাজার সংখ্যক কিতাবাদি লিখেছেন, ওয়াজ-মাহফিল করেছেন। তাঁর সময়ে যত ধরণের দীনী মেহনত চালু ছিল–মসজিদ, মাদরাসা বলুন আর খানকাহ এবং দাওয়াত ও তাবলীগই বলুন তিনি সবগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পর তিনি দেখতে পেলেন, এতো রকম মেহনত চালু থাকার পরও উম্মতের দীনী যিন্দেগীতে কিসের যেন অভাব রয়ে গেছে। যেহেতু তিনি যামানার মুজাদ্দিদ ছিলেন এজন্য তার সামনে কয়েকটি সমস্যা ধরা পড়ল।

মুহতারাম উপস্থিতি! বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝা দরকার। সাধারণ উলামায়ে কেরাম তো মুজাদ্দিদ নন তাই এগুলো তাদের গবেষণায় না-ও আসতে পারে।

হযরত থানবী রহ.এর গবেষণা ও অনুসন্ধানে যে সমস্যাগুলো ধরা পড়ল সেগুলো এই–

এক. ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত ত্রুটি। (অর্থাৎ আমানতু বিল্লাহি, ওয়া মালাইকাতিহী... যার ব্যাখ্যা বেহেশতী যেওর ও তা'লীমুদ্দীন কিতাবে আছে।) তিনি লক্ষ্য করলেন, উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঈমানের তা'লীম নেই, আকীদার তা'লীম নেই। যে কারণে সাধারণ মানুষ শুধু 'ঈমান' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত কিন্তু এর মর্ম ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। অপরদিকে ঈমান-আকীদার তা'লীম যথেষ্ট পরিমাণ না থাকায় সাধারণ মানুষ না বুঝে বিভিন্ন বাতিল ও গোমরাহ ফেরকার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

মুহতারাম উপস্থিতি! আমাদেরকে প্রতিদিন ঈমানের এক একটি শাখা-প্রশাখা নিয়ে নিয়মিত তা'লীম করতে হবে। ঈমানের আলোচনা ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে। উদাহরণত একদিন ঈমানে মুফাস্সালের 'ওয়ারুসুলিহী' শাখা নিয়ে আলোচনা করা হল। তো 'রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম' এই পয়েন্টের তা'লীমে সাধ্যানুযায়ী এর সকল প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যেমন, তামাম নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম মাটির তৈরি (অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী) মানুষ ছিলেন। তারা নিষ্পাপ ছিলেন। তাদের থেকে ছোট বড় কোন গোনাহ প্রকাশ পায়নি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে গায়বী বিষয়াদির যতটুকু তাদেরকে জানানো হয়েছে গায়বের বিষয়ে তারা ততোটুকুই জানতেন। নিজস্ব যোগ্যতায় এর অধিক গায়ব তারা জানতেনও না, জানার শক্তিও রাখতেন না। আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী, তার পরে আর কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে নবী হিসেবে আসবে না। তিনি ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে সাহাবীদের যে বিশাল জামাআত তৈরী করে গেছেন তারা সত্যের মাপকাঠি।

সাহাবায়ে কেরাম কেন সত্যের মাপকাঠি? কুরআন ও হাদীসে তার দলীল আছে!

১. আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহায় আমাদেরকে দু'আ শিখিয়েছেন,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ...الخ

অর্থ : আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান এবং ঐ সকল লোকদের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। (সূরা ফাতিহা- ৫, ৬)

আবার আল্লাহ তা'আলাই পুরস্কৃত বান্দাদের পরিচয় দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ... الخ

অর্থ : যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করেন তারা ঐ সকল লোকদের সাথে থাকবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করেছেন। অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদ ও নেককারগণ। (সূরা নিসা- ৬৯, ৭০)

আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণের অন্যতম ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তো সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি না হলে কেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের উদাহরণ হিসেবে পেশ করলেন?

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

অর্থ : অতঃপর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যেমন ঈমান তোমরা (সাহাবাগণ) এনেছো তবে তারা হেদায়াত পেয়ে যাবে। (সূরা বাকারা- ১৩৭)

এখানে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াতের মাপকাঠি বানিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে।

৩. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...الخ

অর্থ : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।... (সূরা ফাতহ্- ২৯)

এখানে আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার সাহাবীদেরকেও উল্লেখ করেছেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি

সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। (সূরা তাওবা- ১০০)

এখানে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সাহাবী ও তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সত্যের মাপকাঠি।

৫. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ... قال ما أنا عليه وأصحابي

অর্থ : বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিলো আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে আর একটিমাত্র দল জান্নাতে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাতপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'সেই একটি দল তারা, যারা আমি এবং আমার সাহাবীদের তরীকার ওপর আছে।' (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৪১)

এখানে জান্নাতের মাপকাঠি হিসেবে নবীজী শুধু নিজেকে পেশ না করে সাহাবীদেরকেও পেশ করলেন।

অতএব 'ওয়া রুসুলিহী' বলার সময় একজন মুসলমানকে এই সব বিষয় মানতে হবে। অথচ মওদূদী সাহেব লিখেছেন, 'আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কাউকে সত্যের মাপকাঠি মানা যাবে না' (নাউযুবিল্লাহ)। শিয়ারা বলে! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর পাঁচজন সাহাবী বাদে সকলে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল! (নাউযুবিল্লাহ)। সেই পাঁচজন হলেন হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন ও আম্মার রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন। এ জাতীয় কথা বিশ্বাস করলে ঈমান তো থাকবেই না, বরং এক হাদীসে আছে, যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করবে তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬৭৩, শরহু মুশকিলিল আসার; হা.নং ৩২৩২, মুসনাদে আহমাদ ৪/৮৯)

সাহাবা রাযি. যদি কোন ব্যাপারে ভুলও করে থাকেন, আল্লাহ তো কুরআনের মধ্যে তাদেরকে অ্যাডভান্স মাফ করে দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি তো অবশ্যই জানতেন যে, সাহাবীদের মধ্যে জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফ্ফীন সংঘটিত হবে। তথাপি তিনি তাদের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোন ভুল-চুক হয়ে থাকলে তার উদাহরণ সাগরে প্রস্রাব পড়ার মতো। সাগরে প্রস্রাব পড়লে সাগর নাপাক হয় না বরং প্রস্রাবই অস্তিত্ব হারায়। সাহাবায়ে কেরাম দীন-ঈমানের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর এবং ব্যক্তিগত নেক-আমলের এত বড় সাগর ছিলেন যে, তাদের কারও কোন ভুল-চুক হয়ে থাকলে সেগুলো উপেক্ষিত হয়ে অস্তিত্ব হারাবে; এতে তাদের সুমহান মর্যাদার কোন হানি হবে না এবং দীনের জন্য তাদের মাপকাঠি হওয়াও অগ্রাহ্য হবে না।

আলোচনা চলছিল যে, হযরত থানবী রহ. দেখতে পেলেন, আমাদের মধ্যে ঈমান আকীদার তা'লীম যথাযথভাবে হচ্ছে না। অথচ ঈমানের সকল শাখা-প্রশাখায় বিশ্বাস করার নাম হল ঈমান, আর কোন একটা অংশ অস্বীকার করার নাম বে-ঈমানী বা কুফরী।

যেমন 'ওয়া রুসুলিহী' শাখার একটি প্রশাখা হল 'নবীগণ সকলেই নিষ্পাপ'। এখন কেউ এ কথাটা মানল না, মওদুদী সাহেবের মত বলে দিল যে, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর দ্বারা দু-চারটি গুনাহ করিয়ে নিয়েছেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে, তারা খোদা নন!' নাউযুবিল্লাহ। তো কেউ ঈমানের সকল শাখা-প্রশাখার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল শুধু এই একটি প্রশাখায় বিশ্বাস করল না, এতেই সে ঈমানদারের পরিবর্তে বে-ঈমান সাব্যস্ত হবে। কত ভয়ানক ব্যাপার!

ঈমান ও বিশ্বাস এত বড় সম্পদ যে, কারও মধ্যে তা সর্বনিম্ন স্তরে থাকলেও একদিন না একদিন সে জান্নাতে যাবে। আর ঈমান কবুল না হলে তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খায়রাত, মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ সব বেকার হয়ে যাবে, সব মাটি হয়ে যাবে। কারণ ঈমান ছাড়া কোন আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

এজন্য কুরআন হাদীসে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে দেয়া হয়েছে ঈমানের তা'লীম। মাশাআল্লাহ, তাবলীগী ভাইয়েরা এর আংশিক আলোচনা করেন; আর তাদের ছাড়া অন্যেরা তো ঈমানের ব্যাপারে তেমন কিছুই বলে না। অথচ সকল শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়াই ছিল শরীয়তের দাবী।

দুই. হযরতওয়ালা থানবী রহ. লক্ষ্য করলেন, মানুষ কুরআন শরীফ পড়ে, অনেকে সহীহও পড়ে কিন্তু পরিপূর্ণ সহীহ হয় না। লোকেরা যেভাবে কুরআন পড়ে তার দ্বারা নামায মোটামুটি হয়ে যায় এবং এটাকে বারো আনা সহীহ বলা গেলেও ষোলো আনা সহীহ বলা যায় না।

উলামায়ে কেরামের এক ইজতিমায় আমি বলেছিলাম, যারা হারদুয়ী যাননি বা হারদুয়ীতে মশক করেছে এমন কারও কাছে মশক করেননি, তাদের অধিকাংশই হয়তো 'আল্লাহু আকবার' বাক্যটি পরিপূর্ণ শুদ্ধ করে বলতে পারবেন না। 'হু'-কে 'হো' বলবেন, অথচ আরবীতে ও-কার, এ-কার নেই। গোটা কুরআন মাজীদে শুধু এক জায়গায় এ-কার আছে। কিন্তু আমরা তো বহু জায়গায় এ-কার পড়ছি। অনুরূপভাবে আপনি হয়তো কোনদিন শোনেনইনি যে, 'পেশ' উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট মিলে যাওয়ার উপক্রম হবে, ইত্যাদি।

আমরা ঢাকার রাহমানিয়া মাদরাসায় সহীহ বুখারী পড়ানোর পরও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়ায় শাইখের দরবারে হারদুয়ী গিয়ে নূরানী কায়িদা পড়েছি, কুরআনে কারীম বিশুদ্ধ করার মশ্ক করেছি। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আমাদের কয়েকটি হরফ পরিপূর্ণ সহীহ নেই। আরবী ز হরফটি অনেকটা বাংলা 'য' অক্ষরের মত হবে, অথচ আমরা পড়ি ঝড়-তুফানের 'ঝ' এর মত। অর্থাৎ অক্ষরটি তুলনামূলক নরম হবে। কিন্তু আমরা অনেক শক্ত করে পড়ি; যা ঠিক নয়। আমরা এগুলো শেখার জন্য ১৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অন্তত ১৫ বার হারদুয়ী গিয়েছি। আল্লাহর শোকর! বর্তমানে বসুন্ধরা মাদরাসায়, যাত্রাবাড়ী মাদরাসায়, রাহমানিয়া মাদরাসায় হারদুয়ী তরযে কুরআন মশক করার কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আপনারা শিখতে চাইলে এগুলোতে চলে আসেন। আমাদের মতো ১৫০০ কিলোমিটারের কুরবানী পেশ করা আর হাজার হাজার টাকা খরচ করা আপনাদের জন্য জরুরী নয়।

(বাকি অংশ আগামী সংখ্যায়)

পরিচিতি : শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা। বিশিষ্ট খলিফা, মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

সমসাময়িক প্রসঙ্গ

আরবের আলেমগণ কি মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধী?

রাইয়ান বিন লুৎফুর রহমান

প্রতি বছরই আমাদের দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ হজ্জে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মাদীনার উদ্দেশ্যে আরবভূমি সফর করে থাকেন। এছাড়া রুজি-রোযগারের উদ্দেশ্যেও আমাদের দেশের অনেক মানুষ সেখানে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। যে উদ্দেশ্যেই হোক, আরবের পুণ্যভূমি সফর করতে পারা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। তবে সাম্প্রতিককালে আমাদের কিছু ভাই সেখান থেকে সফর করে এসে মুজতাহিদ ইমামগণ এবং তাঁদের সংকলিত ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্নরকম বিষোদগার করে থাকেন। এসব ফিকহী মাযহাব কোত্থেকে এল? আরবে মাযহাব এবং তাকলীদ বলতে তো কিছু নেই? আরবের আলেমগণ তো কোনো মাযহাব অনুসরণ করেন না বরং সাধারণ মানুষকে তাঁরা মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে নিষেধ করে থাকেন ইত্যাদি নানা রকম মন্তব্য তাঁদের মুখে শোনা যায়। অনুরূপভাবে আমাদের দেশের কিছু ভাই আরব থেকে পড়া-শুনা করে এসে মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে অমূলক কথাবার্তা বলে সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে থাকেন। তাদের কথায় মানুষ মনে করে মাযহাব ও তাকলীদ বিষয়ে আরবের আলেমগণও তাদের মতো একই দৃষ্টিভঙ্গী লালন করেন। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অধিকাংশ আরব আলেম কোনো না কোনো মাযহাবেরই অনুসারী। কোনো কোনো আলেম সরাসরি কোনো মাযহাবের সাথে নিজেকে সম্পর্ক বা সম্বন্ধ না করলেও ফিকহ ও ফতোয়া, মাযহাব এবং মাযহাবের অনুসারীদের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করেন। আর সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদকে জরুরি মনে করে থাকেন। বিশেষ করে নিজ দেশের আলিমদের অনুসরণ ও তাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করে থাকেন। মাযহাব ও তাকলীদকে গোমরাহী আখ্যা দেওয়ার যে প্রবণতা তা ওখানের দায়িত্বশীল আলিমগণের বা অনুসরণীয় মাশাইখের প্রবণতা নয়। এটা মূলত অপরিপক্ব ইলমের অধিকারী আবেগপ্রবণ কিছু লোকের প্রবণতা। এখানে নমুনা স্বরূপ সৌদি আরবের এমন কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলেমের বক্তব্য উল্লেখ করার প্রয়াস পাব, যাদেরকে মাযহাব ও তাকলীদ বিরোধীরাও অনুসরণীয় মনে করেন (বরং নিজেরাও তাদের অনুসরণ করে থাকেন)।

১. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী রাহ.-এর বক্তব্য

আরবের মাটিতে তাওহীদ ও সুন্নাহকে যিন্দা করা এবং শিরক-বিদআত নির্মূলে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী রাহ.। বর্তমানে সৌদি আরবের অধিকাংশ আলিম শায়েখ নাজদী রাহ.-এর চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শে বিশ্বাসী। আমাদের সালাফী বন্ধুরাও তাঁর রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ' অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করে থাকেন। মাযহাব ও তাকলীদের বিষয়ে শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী-এর অনেক বক্তব্য রয়েছে। কিছু এখানে উল্লেখ করছি। এক জায়গায় তিনি বলেন–

ونحن أيضاً في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير؛ الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم؛ ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.

অর্থ : আমরা ফিকহী বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহ.-এর মাযহাবের অনুসারী। যারা চার ইমামের কোনো একজনের তাকলীদ করে আমরা তাদের উপর কোনো আপত্তি করি না। কারণ (চার ইমামের মাযহাব সংকলিতরূপে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে) অন্যদের মাযহাব সংকলিত আকারে বিদ্যমান নেই। তবে রাফেযী, যাইদিয়া, ইমামিয়্যাহ ইত্যাদি বাতিল মাযহাব-মতবাদের অনুসরণকে আমরা স্বীকৃতি দিই না। বরং তাদেরকে চার ইমামের কোনো একজনের তাকলীদ করতে বাধ্য করি। –আদ দুরারুস সানিয়্যা ১/২৭৭

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর উপরোক্ত বক্তব্যই প্রমাণ করে তিনি চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণকে কতটা জরুরি মনে করতেন। সেই সাথে এটাও স্পষ্ট হল যে, তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। যারা তাঁর নামে প্রচার করেছিল যে, 'তিনি তাকলীদকে বর্জন করেছেন এবং চার মাযহাবের গ্রন্থগুলিকে বাতিল বলেন' তিনি তাদের এই প্রচারণার বাস্তবতা খণ্ডন করে বলেছেন :

قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد... هذا بهتان عظيم.

অর্থ : যারা আমার নামে প্রচার করছে যে, আমি চার মাযহাবের কিতাবগুলোকে বাতিল বলি, আমি নাকি বলি মানুষ ছয়শ বছর ধরে ভুলের উপর আছে, আমি ইজতিহাদের দাবি করেছি এবং তাকলীদকে বর্জন করেছি, (তাদের এই অপপ্রচারের জবাবে শুধু এটাই বলব,) এটা আমার উপর মিথ্যা অপবাদ। –আর রাসায়েলুস শাখসিয়্যাহ, পৃ. ৪

২. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ রাহ.

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রাহ. ছিলেন সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী এবং শায়খ ইবনে বায রাহ.সহ অনেক আলেমের উস্তায। তাঁর সম্পর্কে শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আলজিবরীন বলেন,

قد لاحظنا ان الشيخ ابن ابراهيم يشرح كتب الحنابلة كالروض المربع ونحوه ويقرر مسائله، ولا يخرج عنها إلا قليلا .

'আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ রাহ. হাম্বলী মাযহাবের কিতাবসমূহ যেমন 'আররওযুল মুরবী' ইত্যাদির ব্যাখ্যা করতেন এবং এখানে উল্লেখিত মাসআলার প্রমাণাদি আলোচনা করতেন। খুব কমই এখান থেকে সরে আসতেন।' –ভূমিকা : আল ইজায ফী ব'দী মাখতালাফা ফীহিল আলবানী ওয়াবনু আসাইমীন ওয়াবনু বায১/৬

৩. শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দী রাহ.

যে সকল মাসআলায় ফিকহ-ফতোয়ার ইমামগণের মাঝে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে ইখতিলাফ হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের কর্তব্য, নিজ অঞ্চলের আলিমদের ফতোয়া অনুসরণ করা। সালাফের যুগে এই নীতিই অনুসরন করা হত। অথচ অনেক সময় গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের দেখা যায়, তারা মতভেদপূর্ণ

মাসআলায় নিজ দেশের আলিমদের পরিবর্তে আরব জাহানের আলিমদের ফতোয়া অনুসরণ করেন এবং অন্যদেরকেও তা মানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। এটা সঠিক নিয়ম নয়। খোদ আরবের আলেমগণ বলে গেছেন, সাধারণ মানুষের কর্তব্য– মতভেদপূর্ণ মাসআলায় নিজ দেশের আলিমদের তাকলিদ করা। যারা এই নীতি অনুসরন করতে বলেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন সৌদি আরবের শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দী রাহ.।

তিনি শায়েখ উছাইমীন রাহ.-এর উস্তায ছিলেন। শায়েখ উছাইমীন রাহ. বলেন,

فالعامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم، وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: "العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلدهم؛ لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع"

অর্থ : সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক হল নিজ দেশের আলিমদের তাকলীদ করা। এই বিষয়টি আমাদের উস্তায আব্দুর রহমান ইবনে সা'দী রাহ. বলে গেছেন। তিনি বলতেন : সাধারণ মানুষের জন্য অনুচিত নিজ দেশের আলিমদের পরিবর্তে অন্য দেশের আলিমদের তাকলীদ বা অনুসরণ করা। কেননা এর দ্বারা লাগামহীনতা ও বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। –লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ১৯/৩২

গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুরা যদি উপরোক্ত নীতি অনুধাবন করতেন এবং অনুসরণ করতেন তাহলে সকল ঝগড়া-বিবাদ এমনি খতম হয়ে যেত।

৪. শায়েখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহ.-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়েখ ইবনে বায রাহ.-কে তাঁর ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন,

مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

'ফিকহের ক্ষেত্রে আমার মাযহাব হল, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর মাযহাব'। –মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৪/১৬৬

তিনি আরো বলেছেন,

وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلهم من الحنابلة، ويعترفون بفضل الأئمة الأربعة و يعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إخوة لهم في الله.

অর্থ : শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর অনুসারী সকলেই হাম্বলী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা চার ইমামকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন এবং চার মাযহাবের অনুসারীদেরকে নিজেদের দ্বীনী ভাই মনে করে থাকেন। –মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/১৫০

ফিকহী মাযহাবগুলি সম্পর্কে সাধারণত আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুরা ধারণা করেন যে, এগুলো নতুন সৃষ্ট এবং এই ফিকহী মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করেছে এবং তাঁদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। শায়েখ ইবনে বায রাহ. এই ধারণা খণ্ডন করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الخلاف المذهبي في أمور الفروع واقع منذ قديم الزمان، و لم يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق.

অর্থ : আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করুন নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন যে, দ্বীনের ফুরু' বা শাখাগত মাসায়েলে ফিকহী মাযহাবসমূহের মধ্যে যে মতপার্থক্য তা নতুন নয় বরং প্রাচীনযুগ (সাহাবাযুগ) থেকেই চলে আসছে। আর এই মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনোরকম হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিভক্তি সৃষ্টি করেনি। –মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/১৪৯

দ্বীনের ফুরু' বা শাখাগত মাসায়েলে মতভিন্নতা যে সালাফ থেকেই চলে আসছে এবং এটা কোনো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয় এই বিষয়টি শায়েখ ইবনে বায রাহ. অসংখ্য জায়গায় বলেছেন। এক জায়গায় তিনি লেখেন,

فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية، ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا، لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله، فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه، فعلينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريق السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم.

অর্থ : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী উলামায়ে কেরাম শাখাগত অনেক মাসায়েলে মতভেদ করেছেন। কিন্তু এই মতভেদ তাঁদের মাঝে বিভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি করেনি কেননা তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ছিল দলীলের ভিত্তিতে সত্যকে জানা। সুতরাং কোনো বিষয়ে যখন দলীলের মর্ম তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তখন তারা একমত হয়ে গেছেন। আর যখন তাঁদের কারো নিকট দলীলের মর্ম অস্পষ্ট ছিল তখন তাঁদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। কিন্তু কেউ তাঁর ভাইকে গোমরাহ বলেননি এবং এর ভিত্তিতে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার পিছনে নামায ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হননি। সুতরাং আমাদের সকলের কর্তব্য হল, আল্লাহকে ভয় করা। হককে আকড়ে ধরা। ঈমানী ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা এবং শাখাগত মাসায়েলে মতভিন্নতার দরুণ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত না হওয়ার যে আদর্শ সালাফে সালেহীন রেখে গেছেন তা গ্রহণ করা। –মাজমুউ ফাতওয়া ইবনে বায ১১/১৪২-১৪৩

ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের দৃষ্টিভংগী যে শায়েখ ইবনে বায রাহ.-এর দৃষ্টিতে ঠিক নয়, আশা করি উপরের আলোচনা দ্বারা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে।

৫. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আলউছাইমীন রাহ.-এর বক্তব্য :

সৌদি আরবের আরেকজন সম্মানিত আলিম, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আলউছাইমীন রাহ.-এরও মাযহাব ও তাকলীদের সমর্থনে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। তিনি নিজের ফিকহী মাসলাকের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পষ্ট বলেছেন,

نحن الآن مذهبنا مذهب الامام أحمد رحمه الله.

অর্থ : বর্তমানে আমাদের মাযহাব হল, ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মাযহাব। –লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ১২/১০০

মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে আরো লেখেন :

الانتماء الى المذهب ودراسة قواعده و أصوله يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة.

অর্থ : কোনো মাযহাবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া এবং তাঁর উসূল ও কাওয়ায়েদ অধ্যয়ন করা মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে সহায়তা করে। –মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইলে উছাইমীন ২৬/২৪৫

এছাড়া শায়েখ উছাইমীন রাহ.-এর শরাহ-ভাষ্যসহ প্রকাশিত ইবনে কুদামা মাকদীসী রাহ.-এর 'লুমআতুল ই'তিকাদ' কিতাবে স্পষ্ট লিখা আছে–

وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة.

অর্থ : দ্বীনের ফুরু' তথা শাখাগত বিষয়ে কোনো ইমামের সাথে সম্বন্ধ নিন্দার

বিষয় নয়। যেমন চার মাযহাব। কারণ, ফুরু'-এর ক্ষেত্রে মতভেদ হচ্ছে রহমত। এই মতপার্থক্যকারীগণ তাদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আজর ও ছওয়াবের অধিকারী। তাদের মতপার্থক্য হল, প্রশস্ত রহমত আর তাদের মতৈক্য হচ্ছে অকাট্য দলীল।

ইবনে কুদামা রহ.-এর উপরোক্ত বক্তব্যকে দালিলিকভাবে প্রমাণ করতে গিয়ে শায়েখ উছাইমীন রাহ.-এর ব্যাখ্যায় লেখেন,

الفروع: جمع فرع وهو لغة : ما بني على غيره، واصطلاحًا: ما لا يتعلق بالعقائد، كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها.

والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرًا عن نية خالصة واجتهاد، لا عن هوى وتعصب؛ لأنه وقع في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم– ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة، حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي –صلى الله عليه وسلم– على واحد منهم" رواه البخاري، ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون؛ ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة.

অর্থ : ...আর পরিভাষায় ফুরু'য়ী বা দ্বীনের শাখাগত মাসায়েল হল, যা আকীদা সম্পৃক্ত নয়, যেমন পবিত্রতা এবং নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল। আর এক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য, এটা কোনো নিন্দনীয় বিষয় নয়। যখন এর ভিত্তি হয় বিশুদ্ধ নিয়্যতের সাথে ইজতিহাদ। খেয়াল-খুশি বা অন্যায় পক্ষপাত নয়। কারণ তা নবীযুগেও সংঘটিত হয়েছে কিন্তু তিনি এর উপর কোনো আপত্তি করেননি। যেমন বনু কুরাইযার যুদ্ধের সময় তিনি বললেন, তোমরা বনু কুরাইযায় আসরের নামায পড়বে। অতপর গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই আসরের সময় হয়ে গেল। একদল নামাযকে বিলম্বিত করলেন, বনী কুরায়যায় পৌঁছে নামায পড়লেন। আর একদল সময় চলে যাচ্ছে দেখে পথিমধ্যেই নামায পড়ে নিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল কোনো পক্ষের উপরই আপত্তি করলেন না, তিরষ্কার করলেন না। আর তাছাড়া এধরনের মতপার্থক্য তো সাহাবীদের মাঝেও হয়েছে। আর তারা হলেন এ উম্মতের সর্বোত্তম শ্রেণী। আর এই মতপার্থক্য উম্মাহর মাঝে কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ বা অনৈক্য সৃষ্টি করে না। –শরহু লুমআতুল ই'তিকাদ পৃষ্ঠা ১৬৪

যারা শাখাগত বিভিন্ন মাসায়েলে মতভিন্নতা দেখে ফিকহী মাযহাবসমূহের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ পোষণ করেন এবং একে উম্মাহর মাঝে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্ত করেন তাঁদের জন্য শায়েখ উসাইমীন রাহ.-এর উপরোক্ত বক্তব্যে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে।

যারা ইজতিহাদী মাসায়েলে ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে গোমরাহ-বিদআতী হিসেবে আখ্যায়িত করে, তাঁদের কঠোর সমালোচনা করে শায়েখ উছাইমীন রাহ. বলেন–

أنا أتحرج من أن يكون مخالفٍ السنة على وجه يسوغ فيه الاجتهاد مبتدعا، فالذين يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع إنما يبنون قولهم هذا على دليل من السنة، فكوننا نقول: إن هذا مبتدع؛ لأنه خالف اجتهادنا، هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة في مصل هٍذا؛ لأنه يؤدي إلى تبديع الناس بعضهم بعضاً فٍي المسائل الاجتهادية التي يكون الحق فيها محتملا في هذا القول أو ذاك، فيحصل به من الفرقة والتنافر ما لا يعلمه إلا الله.

'যে বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে সে বিষয়ে কাউকে সুন্নাতের পরিপন্থী-বিদআতী বলতে আমি সংকোচবোধ করি। এটা উচিত নয়। ... এ বিষয়টি কারো গবেষণার বিরোধী হলে তাকে সরাসরি বিদআতী বলা খুবই কঠিন বিষয়। এ ধরনের বিষয়ে বিদআত শব্দ উচ্চারণ করা কারো পক্ষে উচিত নয়। কেননা যেসকল বিষয়ে গবেষণার অবকাশ থাকে এবং হতে পারে এ মতটি সঠিক অথবা ঐ মতটি সঠিক, তাতে পরস্পরে বিদআতের অপবাদ দিতে শুরু করলে মুসলিমসমাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সূচনা হবে। ইসলামের শত্রুরা তা নিয়ে হাসাহাসি করবে। –ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম পৃষ্ঠা ৩৯২

শায়েখ উছাইমীন রাহ. সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদকে অত্যন্ত জরুরি মনে করতেন। বিশেষত মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলায় নিজ দেশের আলিমদের অনুসরণ এবং তাদের সাথে যুক্ত থাকার প্রতি জোর তাকিদ দিতেন। এক জায়গায় তিনি লেখেন–

أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالي (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

অর্থ : যেসব সাধারণ মানুষ সরাসরি শরীয়তের বিধি-বিধান জানতে সক্ষম নন তাদের জন্য তাকলীদ করা ফরয। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) তোমরা যদি না জান তাহলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা কর। –আলউসুল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৮৭

নিজ অঞ্চলের আলিমদের অনুসরণের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে শায়েখ উছাইমীন রাহ. বলেন–

...لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماؤك، ولو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي... فالعامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم.

অর্থ : ...নিশ্চয়ই তোমার কর্তব্য হল তাকলীদ করা। আর তোমার তাকলীদের সবচে বড় হকদার হল তোমার (দেশের) আলিমগণ। যদি তুমি তা না করে বাইরের দেশের আলিমদের তাকলীদ কর তবে তা লাগামহীনতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। সুতরাং সাধারণ মানুষের কর্তব্য নিজ দেশের আলিমদের অনুসরণ করা। –লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ১৯/৩২

গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের ধারণা, তাকলীদ চতুর্থ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে। অথচ তাকলীদ সাহাবা যুগ থেকেই চলে আসছে। এ বিষয়ে শায়েখ উছাইমীন রাহ. লেখেন :

والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن من الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهدنا هذا من لا يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه لجهله وقصوره، ووظيفة هذا أن يسأل أهل العلم، وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ بما قالوا، والأخذ بما قالوا هو التقليد.

অর্থ : বাস্তব কথা হল, তাকলীদ সাহাবা যুগ থেকেই চলে আসছে। কেননা সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে এই যুগ পর্যন্ত সবসময়ই এমন মানুষ থাকেন, যারা নিজে নিজে শরীয়তের বিধান জানতে সক্ষম নন। তাঁদের কর্তব্য, আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে সেই অনুপাতে আমল করা। আর এটাই তাকলীদ। –ফতোয়া নূর আলাদদারবি ২/২২০

মাযহাব এবং তাকলীদ বিষয়ে শায়েখ উসাইমীন রাহ. যা বললেন, এরপরেও যদি আমাদের ঐ বন্ধুরা আশ্বস্ত না হন তবে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।

৬. শায়খ সালিহ ইবনে ফাওযানের বক্তব্য

সৌদি আরবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম শায়খ সালিহ ইবনে ফাওযানেরও এ বিষয়ে বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে। মাযহাব অনুসরণ যে জরুরি এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে শায়খ সালিহ ফাওযান লেখেন–

هاهم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي وابن حجر شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفيا وابن عبدالبر كان مالكيا.

অর্থ : বড় বড় হাদীস বিশারদ ইমামগণ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও ইবনুল কায়্যিম রাহ. ছিলেন হাম্বলী, ইবনে হাজার রাহ. ও ইমাম নববী রাহ. ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম ত্বহাবী রাহ. ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইবনু আব্দিল বার রাহ. ছিলেন মালেকী মাযাহবের অনুসারী। –ইয়ানাতুল মুসতাফিদ শরহু কিতাবিত তাওহীদ ১/১২

৭. শায়েখ আবু বকর জাবের আল জাযায়েরী-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, মসজিদে নববীর ওয়ায়েজ আবু বকর জাবের জাযায়েরী সূরা আম্বিয়া এর ৭নং আয়াত فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون-এর তাফসীরে লেখেন :

وفي الآية دليل على وجوب تقليد العامة العلماء، إذ هم أهل الذكر، ووجوب العمل بما يفتونهم به ويعلمونهم به.

অর্থ : উপরের আয়াতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে সাধারণ মানুষের উপর উলামাদের তাকলীদ করা ওয়াজিব। কেননা আয়াতে 'আহলুয যিক্‌র' বলে উলামাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং আলেমগণ যা ফতোয়া দেন, যা শিক্ষা দেন সেটার উপর আমল করা ওয়াজিব। –আইসারুত তাফাসীর পৃ. ৭৭০

৮. শায়খ আতিয়্যা সালিম রাহ.-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের আরেকজন প্রসিদ্ধ আলিম, মসজিদে নববীর মশহুর মুদাররিস এবং মদীনা মুনাওওয়ারার কাযী শায়খ আতিয়্যা সালিম রাহ. যারা ফিকহী মাযহাবের দলীল নির্ভর মতভেদকে দোষণীয় মনে করেন এবং উম্মাহর মাঝে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা জ্ঞান করে একে নির্মূল করার চেষ্টা করছেন তাঁদের চিন্তাকে সংশোধন করে বলেন–

إن الاختلاف أمر من لوازم البشر، ولا يمكن رفعه، ولأنه لا يشكل خطرا على الأمة، فقد كانوا يختلفون في الرأي مع اتحاد كلمتهم وتوحيد صفوفهم.

অর্থ : নিশ্চয়ই ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা মানুষের স্বভাবজাত একটি বিষয়। এটি নির্মূল করা সম্ভব নয়। (দলীল নির্ভর) ইখতিলাফ উম্মাহর জন্য কোনো ক্ষতিকর বিষয় নয়। তাঁরা (সালাফে সালেহীন) অনেক বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মাঝে কোনো বিভেদ ছিল না। –মাওকিফুল উম্মাহ মিন ইখতিলাফিল আইম্মাহ পৃ. ১৪

৯. শায়খ মুহাম্মাদ আমীন শানকীতি রাহ.-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন শায়খ শানকীতি রাহ.। তাঁর 'আযওয়াউল বয়ান' তো খুবই প্রসিদ্ধ। শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ উসাইমীন রাহ.ও অনেক সময় 'আযওয়াউল বয়ান' কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে থাকেন। (দ্র. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম পৃ. ৩৯৭) এই কিতাবে শায়খ শানকীতি রাহ. লেখেন–

ولم يختلف العلماء، أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

অর্থ : এ বিষয়ে কোনো আলিমের দ্বিমত নেই যে, সাধারণ মানুষের জন্য আলিমদের তাকলীদ করা আবশ্যক। কেননা আয়াতে আহলুয যিকর দ্বারা আহলে ইলমই উদ্দেশ্য। –আযওয়াউল বয়ান ৭/৪৯৫

তিনি আরো লেখেন–

وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر، وهم العلماء أو العلماء والأمراء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার আনুগত্য করার, রাসূলের আনুগত্য করার এবং 'উলুল আমর'-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আলেমগণ অথবা উলামা ও উমারা উভয়ই। তাঁদের আনুগত্যের অর্থ হল, তাঁরা যে ফতোয়া দেন সেই বিষয়ে তাদের তাকলীদ করা। –আযওয়াউল বয়ান ৪/৫০১

১০. রাবেতা আলমে ইসলামীর সিদ্ধান্ত

সবশেষে ফিকহি মাযহাবের ইখতিলাফ ও মতভিন্নতার ধরন সম্পর্কে বর্তমান যুগের বড় বড় মনীষীর প্রতিনিধিত্বে ১৪০৮ হিজরীতে 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী' মক্কা মুকাররমায় যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল তার মূল অংশ তুলে ধরছি–

إن اختلاف المذاهب الفكرية، القائم في البلاد الإسلامية نوعان :

أ- اختلاف في المذاهب الاعتقادية .

ب- واختلاف في المذاهب الفقهية .

فأما الأول، وهو الاختلاف الاعتقادي، فهو في الواقع مصيبة، جرّت إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له، ويجب أن لا يكون، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة، الذي يمثل الفكر الإسلامي، النقي السليم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله : "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ".

وأما الثاني، وهو اختلاف المذاهب الفقهية، في بعض المسائل، فله أسباب علمية، اقتضته، ولله – سبحانه – في ذلك حكمة بالغة : ومنها الرحمة بعباده، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة، وثروة فقهية تشريعية، تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق حكم شرعي واحد حصرا، لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما، أو في أمر ما، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة، أم في المعاملات، وشؤون الأسرة، والقضاء والجنايات، على ضوء الأدلة الشرعية.

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة، ولا تناقضاً في ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي .

فالواقع أن هذا الاختلاف، لا يمكن أن لا يكون، لأن النصوص الأصلية، كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة، لأن النصوص محدودة، والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء – رحمهم الله تعالى– فلا بد من اللجوء إلى القياس، والنظر إلى علل الأحكام، وغرض الشارع، والمقاصد العامة للشريعة، وتحكيمها في الوقائع، والنوازل المستجدة. وفي هذا تختلف فهوم العلماء، وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق، ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج.

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي، الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة، وأنه في الواقع نعمة، ورحمة من الله بعباده المؤمنين،

وهو في الوقت ذاته، ثروة تشريعية عظمى، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية.
ولكن المضللين من الأجانب، الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم، ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا، ليوحوا إليهم ظلما وزوراً، بأنه يدل على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما.

ثانيا : وأما تلك الفئة الأخرى، التي تدعو إلى نبذ المذاهب، وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة، وفي أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية، ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض، الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس، ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام، بدلا من هذه الدعوة المفِرّقة التي لا حاجة إليها.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.

"মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত চিন্তানৈতিক মতবিরোধ সাধারণত দু'ধরনের।

ক) আকীদা ও বিশ্বাসগত মতবিরোধ।

খ) আহকাম ও বিধানগত মতবিরোধ।

প্রথমোক্ত মতবিরোধ...। আর দ্বিতীয়তটি হল, কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ফিকহী মাযহাবসমূহের মতপার্থক্য, যার অনেক শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে। এবং যাতে আল্লাহ তাআলার নিগূঢ় হিকমত রয়েছে। যেমন বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ এবং নুসূস থেকে আহকাম ও বিধান উদঘাটনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা। তাছাড়া এটা হল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিরাট নিআমত এবং ফিকহ ও কানুনের মহাসম্পদ, যা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা দিয়েছে। ফলে তা নির্ধারিত একটি হুকুমের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে কোনো অবস্থাতেই বের হওয়ার সুযোগ নেই। বরং যে কোনো সময়ই কোনো বিষয়ে যদি কোনো একজন ইমামের মাযহাব সংকীর্ণতার কারণ হয়ে যায় তাহলে শরঈ দলিলের আলোকেই অন্য ইমামের মাযহাবে সহজতা ও প্রশস্ততা পাওয়া যাবে। তা হতে পারে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা মুআমালা সংক্রান্ত অথবা পারিবারিক কিংবা বিচার ও অপরাধ সংক্রান্ত। তো আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের মাযহাবী ইখতিলাফ আমাদের দ্বীনের জন্য দোষের কিছু নয় এবং তা স্ববিরোধিতাও নয়। এ ধরনের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। এমন কোনো জাতি পাওয়া যাবে না যাদের আইন-ব্যবস্থায় এ ধরনের ইজতিহাদী মতপার্থক্য নেই।

অতএব বাস্তবতা এই যে, এ ধরনের মতভেদ না হওয়াই অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন নুসূসে শরয়ী অনেক ক্ষেত্রে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে অন্যদিকে শরয়ী নস সম্ভাব্য সকল সমস্যাকে সুস্পষ্টভাবে বেষ্টন করতে পারে না। কারণ নুসূস হল সীমাবদ্ধ আর নিত্য-নতুন সমস্যার তো কোন সীমা নেই।

অতএব কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া এবং আহকাম ও বিধানের ইল্লত, বিধানদাতার মাকসাদ; শরীয়তের সাধারণ মাকসাদসমূহ বোঝার জন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতে হবে।

এখানে এসেই উলামায়ে কেরামের চিন্তার বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন দিকের কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আসে। অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হক্ব ও সত্যের অনুসন্ধান। কাজেই যার ইজতিহাদ সঠিক হবে তিনি দুটি বিনিময় পাবেন এবং যার ইজতিহাদ ভুল হবে তিনি একটি বিনিময় পাবেন। আর এভাবেই সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং যে মতপার্থক্য কল্যাণ ও রহমতের ধারক তা বিদ্যমান থাকলে দোষ কেন হবে? বরং এ তো মুমিন বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহ। বরং মুসলিম উম্মাহর গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু মুসলমান তরুণ, বিশেষত যারা বাইরে লেখাপড়া করতে যায় তাদের ইসলামী জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগে কিছু গোমরাহকারী লোক তাদের সামনে ফিকহী মাসআলার এজাতীয় মতপার্থক্যকে আকীদার মতভেদের মতো করে তুলে ধরে। অথচ এ দু'য়ের মাঝে আকাশ-পাতালের ব্যবধান!

দ্বিতীয়ত যে শ্রেণীর লোকেরা মানুষকে মাযহাব বর্জনের আহ্বান করে এবং ফিকহের মাযহাব ও তার ইমামগণের সমালোচনা করে এবং মানুষকে নতুন ইজতিহাদের মধ্যে নিয়ে আসতে চায় তাদের কর্তব্য, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা, যা দ্বারা তারা মানুষকে গোমরাহ করছে এবং ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। অথচ এখন প্রয়োজন ইসলামের দুশমনদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করা।"

–মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহী, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা : ৫৯, ২১৯

উপরোক্ত রেজুলেশনে যাদের স্বাক্ষর রয়েছে :

আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায, রঈস

ড. আব্দুল্লাহ উমর নাসিফ, নায়েবে রঈস

মুহাম্মাদ আশশাযিলী আননাইফার, সদস্য

মুহাম্মাদ আলহাবীব ইবনুল খাওজা, সদস্য

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুবায়্যিল, সদস্য

আবুল হাসান আলী নদবী, সদস্য

আবু বকর জুমী, সদস্য

মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর, সদস্য

সালেহ ইবনে ফাওযান আলফাওযান, সদস্য

মুহাম্মাদ মাহমুদ আসসাওয়াফ, সদস্য

আব্দুল্লাহ আবদুর রহমান আলবাসসাম, সদস্য

মুস্তফা আহমাদ আযযারকা, সদস্য

মুহাম্মাদ রশীদ রাগেব কাবানী, সদস্য

ড. আহমাদ ফাহমী আবু সুন্নাহ, সদস্য;

মুহাম্মাদ সালেম ইবনে আবদুল ওয়াদূদ, সদস্য।"

মোটকথা সৌদি আরবের মূল ধারার আলেমগণ মুজতাহিদ ইমামও তাদের সংকলিত ফিকহী মাযহাবসমূহের ব্যাপারে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। তারা কখনোই মাযহাব ও মাযহাবের অনুসারীদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেন না। যারা এই ধরনের কাজে ব্যতিব্যস্ত তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে গিয়েছে। সুতরাং যেই জিনিস হেজাযের বাইরে থেকে হেজাযের ভিতরে প্রবেশ করেছে সেটাকে আরবের মনে করে এই দেশে নিয়ে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

সৌজন্যে : মাসিক আলকাউসার, জানুয়ারি-২০১৬ ও রাহনুমা প্রকাশনী।

অধীনস্তদের অধিকার ও বর্তমান সমাজ

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।' (সূরা বাকারা- ২০৮) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেন, পরিপূর্ণ ইসলাম হল পাঁচটি জিনিসের নাম। কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তাকে এ পাঁচটি বিষয় পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। পাঁচটি বিষয় হল ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত এবং আখলাকিয়াত। অর্থাৎ আকীদা-বিশ্বাস দুরস্ত করার মাধ্যমে ঈমান ঠিক করা, সুন্নাত তরীকায় ইবাদত-বন্দেগী করা, রিযিক হালাল রাখা, কার কী হক তা জেনে সেগুলো আদায় করা আর অন্তরের দশটি রোগ দূর করে দশটি গুণ পয়দা করা।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করি তাদের মধ্যে প্রথম দু'টি জিনিস মোটামুটিভাবে বিদ্যমান থাকলেও অবশিষ্ট তিনটি জিনিস সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা, অনেক উলামায়ে কেরামের মধ্যেও পুরোপুরি নেই।

ঈমানিয়াত অর্থাৎ সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঈমান অনেকেরই দুরস্ত আছে। ইবাদাত অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা আদায়ের প্রতিও আমরা সকলে মোটামুটি সচেষ্ট থাকি। কিন্তু বাকি তিনটি জিনিস যথা, মু'আমালাত অর্থাৎ আয়-রোযগার, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী, ক্ষেত-খামার হালালভাবে খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক আলেম-উলামাও মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান থেকে অনেক দূরে।

মু'আশারাত অর্থাৎ সমাজে কার কী হক পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, উস্তাদ-ছাত্র, কর্মচারী-মালিক, শ্রমিক-মজদুর এমনকি পশু-পাখি, গরু-ছাগল এদেরও কী হক সে সম্পর্কে আমরা একেবারে উদাসীন। হক আদায় করা তো দূরের কথা আমরা এটা জানারও চেষ্টা করি না যে, কার কী হক? কার কী প্রাপ্য? অথচ হক নষ্ট করা এমন বিষয় যে, কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে নিজের সমস্ত আমল হকদারকে দিয়ে দিতে হবে।

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান প্রকৃত নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো নিঃস্ব বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝি যার কোন টাকা-পয়সা বা সহায়-সম্পত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকৃত নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে; সাথে সাথে এটাও নিয়ে আসবে যে, দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করেছিল। অতঃপর তার নেকি থেকে কিছু একজনকে, কিছু অন্যজনকে দেয়া হবে। হকদারদের দাবী শেষ হওয়ার আগেই যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায় তাহলে তাকে হকদারদের সোপর্দ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিমঃ বাব, আল-বির ওয়াছ ছিলাহ)

মু'আশারাত তথা হক আদায়ে শিথিলতা থাকলে তার পরিণতি কি রকম ভয়াবহ হবে তা এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় অনেক ভালো ভালো মানুষ যারা নিজেদেরকে দীনদার মনে করে, দীনের উপর চলার দাবী করে, অপরের হক আদায়ের ব্যাপারে তারাও অত্যন্ত উদাসীন। বিশেষ করে যারা অধীনস্ত তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতা আরো বেশি। কাজের লোক, গাড়ির ড্রাইভার, দোকানের কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক যারা আমাদের অধীনস্ত তাদের থেকে আমরা কাজটা কি পরিমাণ বুঝে নেই আর তাদের হক আমরা কতটুকু আদায় করি, তা অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। এ পর্যায়ে আমরা কয়েকটি হক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১. সন্তানের হক।
২. ছাত্রের হক।
৩. কর্মচারীর হক।
৪. প্রজাদের হক।

সন্তানের হক

পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক অনেক বেশি। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হল, সন্তানকে চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে দীনী ইলম শিক্ষা দেয়া। অনেক পিতা-মাতা সন্তানকে দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত না করে ভোগ-বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবিয়ে রাখেন। খুব মনে রাখবেন, শৈশবে সন্তানের আখলাক-চরিত্র ভালো না হলে এবং তাকে দীন শিক্ষা না দেয়া হলে পরবর্তীতে তার পরিণাম খুবই খারাপ হয়। যখন কুরআনে পাকের আয়াত (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) অবতীর্ণ হল, তখন হযরত উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর বিষয়টি তো বুঝে আসে যে, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ মেনে চলব। কিন্তু পরিবার-পরিজনকে কীভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর উপায় হল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ করবে এবং যেসব কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করার আদেশ দিবে। এভাবে করলে তোমরা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে। (তাফসীরে রূহুল মা'আনী ১৪/১৫৬)

একটি হাদীসে এর পদ্ধতি এভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তোমরা তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও আর দশ বছর বয়স হলে প্রয়োজনে শাসনের জন্য প্রহার করে হলেও নামায পড়াও। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৯৫)

হযরত আলী রাযি. বলেছেন, তোমরা নিজেদেরকে এবং স্ত্রী-সন্তানদেরকে দীন শেখাও এবং তাদের আখলাক-চরিত্র গঠন কর।

সন্তানের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যেমন অধিকার আছে তেমনি পিতা-মাতার প্রতিও সন্তানের অনেক অধিকার রয়েছে। এমনকি সন্তানের এ অধিকারগুলো পিতা-মাতার অধিকারের উপর অগ্রগণ্য। যে পিতা-মাতা এ অধিকারগুলো সুন্দরভাবে আদায় করবে কেবল তারাই সন্তানের নিকট থেকে

নিজেদের অধিকার আদায়ের নৈতিক শক্তি লাভ করবে। যারা সন্তানের অধিকার আদায় করে না তাদের জন্য সন্তানের নিকট থেকে অধিকার আদায়ের কোন হক নেই। প্রতিটি সন্তান পিতা-মাতার নিকট কয়েকটি ন্যায্য দাবী রাখে। এগুলোকে সন্তানের হক বা অধিকার বলে। পিতা-মাতার জন্য জরুরী হল, সন্তানের এ দাবীগুলো যথার্থভাবে আদায় করা।

এ পর্যায়ে সন্তানের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) প্রতিটি সন্তানের প্রথম দাবী ও অধিকার হল, তার 'মা' নেককার হওয়া। যাতে করে দীনদার মায়ের গর্ভে একজন নেক সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে। তাই পিতার দায়িত্ব হল নেককার, দীনদার, চরিত্রবান মেয়েকে বিবাহ করা। যাতে সন্তানও নেককার হয়।

(২) সন্তানকে শৈশব থেকেই স্নেহ, মায়া, মমতাসহ লালন-পালন করা। সন্তানকে ভালোবাসার ফযীলত অনেক। বিশেষত কন্যা সন্তানের জন্ম ও লালন-পালনে অন্তরে কোন প্রকারের সঙ্কীর্ণতা ও অনীহা না থাকা। মেয়েদের লালন-পালনের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। মোটকথা, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে প্রত্যেকের একটি গুরুত্বপূর্ণ হক হল, পিতা-মাতার পরিপূর্ণ ভালোবাসা পাওয়া।

(৩) প্রয়োজনে অন্য মহিলার দুধ পান করাতে হলে দীনদার ও চরিত্রবান মহিলা নির্বাচন করা। কেননা বাচ্চার রুচি, চরিত্র, আদর্শ, বিশ্বাস ও অভ্যাসে দুধের প্রভাব অনেক বেশি। অর্থাৎ বাচ্চার আদব-আখলাক ও মন-মানসিকতা তার মতই হয় যার দুধ সে পান করে।

(৪) সন্তানকে দীনী ইলম ও আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়া।

(৫) বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেলে বিবাহ দেয়া। বিনা কারণে বিলম্ব না করা। এতে অনেক সময় তাদের চরিত্র বিগড়ে যেতে দেখা যায়।

(৬) মেয়েকে বিয়ে দেয়ার পরে তার স্বামী মারা গেলে দ্বিতীয় বিয়ে হওয়া পর্যন্ত নিজের বাড়িতে তাকে অত্যন্ত যত্ন ও আরামের সাথে রাখা এবং তার জরুরী ভরণ-পোষণসহ অন্যান্য প্রয়োজন পুরা করা।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত উমর ফারূক রাযি. এর খিলাফতকালে জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি হযরত উমরের নিকটে এ মর্মে অভিযোগ করল যে, তার ছেলে তার হক আদায় করে না। হযরত উমর রাযি. ছেলেকে ডেকে তার বিরুদ্ধে পিতার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ছেলে বলল, আমীরুল মুমিনীন! অভিযোগ সম্পর্কে উত্তর দেয়ার আগে আপনার নিকট আমার একটি প্রশ্ন আছে। সেটা হল, ইসলামে কি শুধু সন্তানের প্রতি পিতার অধিকার সাব্যস্ত আছে, নাকি পিতার উপর সন্তানেরও কিছু অধিকার আছে? হযরত উমর রাযি. বললেন, পিতার উপর সন্তানেরও কিছু অধিকার আছে। ছেলেটি বলল, আমি আপনার মুখে সেই অধিকারগুলোর কথা শুনতে চাই। হযরত উমর রাযি. বললেন, পিতার উপর সন্তানের অন্যতম তিনটি হক হল,

(১) সন্তান লাভের জন্য দীনদার স্ত্রী নির্বাচন করা।

(২) সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার একটি অর্থবহ সুন্দর ইসলামী নাম রাখা।

(৩) সন্তানের জ্ঞান-বুদ্ধি হলে তাকে আদব-আখলাক এবং দীনী ইলম শিক্ষা দেয়া।

একথা শুনে ছেলেটি বলল, আমার পিতা আমার এই তিনটি হকের একটিও আদায় করেননি। তিনি দীনদার মহিলার পরিবর্তে একজন বাজারী মহিলাকে বিয়ে করেছেন, জন্মের পরে আমার ভালো কোন নাম রাখেননি, আর দীনের কোন বিষয়ও আমাকে শিক্ষা দেননি।

ছেলের বক্তব্য শুনে হযরত উমর রাযি. তার পিতার প্রতি খুব রাগান্বিত হলেন এবং তাকে ভৎর্সনা করলেন। অতঃপর একথা বলে অভিযোগ খারিজ করে দিলেন যে, যাও সন্তানের হক আদায় না করে তার প্রতি যে অবিচার করেছো আগে তার ক্ষতিপূরণ কর এরপর ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর।

সন্তানকে দীন শিক্ষা না দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি

পিতা-মাতা সাধারণত সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে থাকে। এর জন্য তারা বিভিন্নভাবে দৌড়ঝাঁপও করে। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করতে তাকে কোথায় পড়াবে, কী পড়াবে এ নিয়ে বেশ টেনশনে থাকে। পরে খোঁজ-খবর ও যাচাই শেষে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে সচেষ্ট হয়। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার এই উদ্বেগ ও প্রচেষ্টা অবশ্যই কাম্য এবং ভালো। কিন্তু কথা হল, সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনায় আমরা যা কিছু করি এবং তাদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের পেছনে যেভাবে অর্থ-সময় ব্যয় করি, শ্রম দিয়ে প্রতিপালন করি তা মূলত কসাইয়ের গরু পালনের মত। কসাই গরু কিনে খুব যত্নের সাথে তাকে লালন-পালন করে। প্রচুর ঘাস-পানি খাওয়ায়। ফলে অতি অল্প সময়েই গরু মোটাতাজা হয়ে যায়। কিন্তু এর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে তার গলায় ছুরি চালানো। আমাদের অভিভাবকদের দশাও তাই। সন্তান দুনিয়াতে কিভাবে ভালো লেখাপড়া শিখে বড় চাকুরী করতে পারবে, বড় পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে, অনেক বেশি অর্থ-সম্পদের মালিক হতে পারবে এটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। দীন শিক্ষা না দেয়ার কারণে এভাবে তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনরূপে গড়ে তোলা হয়। কসাই তো গরু পালন করে একসময় জবাই করে তা দ্বারা পার্থিব উপকার হাসিল করে। কিন্তু এসব পিতা-মাতারা কি করলেন? দু'দিনের সুখ-শান্তির স্বপ্ন দেখিয়ে অনন্তকালের জাহান্নামে ঠেলে দিলেন! এই যদি হয় পিতা-মাতার অবস্থা তাহলে সন্তানের জন্য তাদের মায়াকান্নার কি স্বার্থকতা থাকতে পারে!

অনেক পিতা-মাতা সন্তানের অধিকার বলতে শুধু তাদের ভরণ-পোষণ আর বৈষয়িক শিক্ষা বুঝে থাকে। যদি তারা লেখাপড়া আর আয়-রোজগারে মনোনিবেশ করে এবং পিতা-মাতা নামায-রোযা করে তাহলে একথা ভেবে তারা চরম আত্মতৃপ্তি লাভ করে যে, আমারা সফলকাম, জান্নাত এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে গেছে। অথচ তাদের খবরও নেই যে, সন্তান নামায-রোযা ইত্যাদি না করার কারণে যখন জাহান্নামে যাবে তখন সাথে করে এই নামাযী পিতা-মাতাকেও জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কেননা তারা সন্তানকে দীনী ইলম শিক্ষা দেয়নি। সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করায়নি।

সন্তানকে নেককার বানানোর উপায়

কিতাব-পত্র থেকে নেককার হওয়ার নিয়ম পড়ার দ্বারা নেককার হওয়া যায় না। বরং প্রকৃত সৎগুণ অর্জিত হয় কোন আল্লাহওয়ালা নেককার লোকের সান্নিধ্যে থাকার দ্বারা। সুতরাং সন্তানকে নেককার বানাতে হলে কোন বুযুর্গের সান্নিধ্যে কিছুদিন রাখতে হবে। কমপক্ষে মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া, তার থেকে দু'আ নেয়া, তার মজলিসে কিছুক্ষণ বসানোর অভ্যাস করার দ্বারাও এই গুণ অর্জিত হতে পারে। একান্ত সম্ভব না হলে বিভিন্ন ছুটির সময় কোন আল্লাহওয়ালার

সান্নিধ্যে রাখা অবশ্যই জরুরী। ছুটির সময়গুলো বাচ্চারা খামাখা নষ্ট করে। পিতামাতা উক্ত সময়কে সন্তানের আখেরাত গড়ার কাজে লাগাতে পারেন। কাজেই সন্তানের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আদব-আখলাক শেখার অপূর্ব সুযোগ মনে করে এ সময় তাকে কোন নেককার বুযুর্গের সোহবতে পাঠিয়ে দিন।

ছাত্রের হক

ছাত্ররা শিক্ষকদের অধীনস্ত। ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি নৈতিকতা, শিষ্টাচার, আদব-আখলাক ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হতে পারল কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে কওমী মাদরাসার ছাত্র, যারা সার্বক্ষণিক মাদরাসায় অবস্থান করে এবং পিতা-মাতারা এই সন্তানদেরকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে তাদের সোপর্দ করে দিয়েছে। সুতরাং এসব ছাত্রদের সময় ও জান উস্তাদের হাতে আমানত। ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি উত্তম আমল-আখলাক এবং সুন্নাতের প্রতি মনোযোগী কিনা সে বিষয়টি দেখার দায়িত্ব উস্তাদের। ছাত্রদেরকে শুধু পড়িয়ে দেয়াই যথেষ্ট নয়। অনেক মাদরাসায় দেখা যায় উস্তাদগণ শুধু কোন রকমে দরস দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করেন। এরপরে ছাত্ররা কোথায় গেল, কার সাথে মিশল, মোবাইল ঘাটাঘাটি করে কী সব দেখল এসব বিষয়ে খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। ফলে দেখা যায় এসব ছাত্র আট/দশ বছর কুরআন হাদীস পড়ার পরেও তার নামায সহীহ হয় না, অন্যান্য আমল সুন্নাত অনুযায়ী হয় না। পিতা-মাতা যে আশা নিয়ে সন্তানকে মাদরাসায় দিয়েছিল সে আশা আর পুরা হয় না। এজন্য উস্তাদদেরকে দায়ী থাকতে হবে। শুধু মাদরাসা খুলে বসলেই হবে না। পরিতাপের বষয় হল, মাদরাসার দরসের পরে আর কোন উস্তাদকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাত্ররা এতীমের মত এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করতে থাকে। অনেক মাদরাসায় আযান-ইকামত সহীহ তরীকায় হয় না। ছাত্রদের লেবাস-পোশাক সুন্নাত মত হয় না। ইংরেজি শিক্ষিতদের মত মাথার চুল বড় বড় থাকে । মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এদিকে কোন দৃষ্টি দেয় না। এভাবে ছাত্রদের হক নষ্ট করার কারণে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সুতরাং কোন রকমে একটা মাদরাসা চালু করলেই হবে না। প্রথমে নিয়ত সহীহ করতে হবে যে, কী জন্য আমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছি কিংবা মাদরাসায় পড়াচ্ছি।

কর্মচারীর হক

সহীহ বুখারীর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক আর যার তত্ত্বাবধানে যারা আছে তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। (হা.নং ৫২০০)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যার অধীনে যারা আছে তাদেরকে দীনদার বানানো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যিম্মাদারী। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দাসী-বাঁদীকে দীনী কথা শিক্ষা দেয়াও সওয়াবের কাজ। একজন দোকানের মালিক যার অধীনে দুই/একজন কর্মচারী কাজ করে তাদেরকে দীন শেখানো মালিকের যিম্মাদারী। যিনি কারখানার মালিক, গার্মেন্টসের মালিক তার দায়িত্ব সমস্ত কর্মচারীকে দীন শেখানো, নামাযী বানানো। যিনি নেতা তার দায়িত্ব সমস্ত কর্মীকে দীনদার বানানো। এই দায়িত্ব পালন না করলে কিয়ামতের দিন তারা পাকড়াও হবে। অনুরূপভাবে শ্রমিক, মজদুর, কর্মচারীর বেতন, ভাতা, বোনাস যৌক্তিক পরিমাণে এবং সময়মত আদায় করাও মালিকের অন্যতম যিম্মাদারী। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ কর। আমরা যদি এই হাদীসের উপর আমল করতাম তাহলে বেতন-ভাতার দাবীতে শ্রমিকদের রাজপথে নামতে হত না। আমরা শ্রমিকদের নিকট থেকে আমাদের পাওনা পুরোপুরি বুঝে নিতে চাই কিন্তু তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে আমাদের খুব কষ্ট হয়।

অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোকদেরকে দেখা যায়, ঘরের কাজের লোক অর্থাৎ গৃহপরিচারকের সাথে খারাপ আচরণ করে। তাকে বাসি-পঁচা, এঁটো-ঝুটা ইত্যাদি খেতে দেয়। নিজেরা পালঙ্কে শুয়ে তাকে মেঝেতে শুতে দেয়। নিজেরা মশারীতে শুয়ে তাকে মশার হাতে সোপর্দ করে দেয়। সামান্য সামান্য কারণে অমানবিক আচরণ করে। মারপিট করে, গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাকা দেয়। আরো অনেক অত্যাচার নির্যাতন করে। যেগুলো শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারে হারাম। কাজের লোকের উপর এভাবে যুলুম-নির্যাতন করলে নামায-কালাম, ইবাদত-বন্দেগী কোন কাজে আসবে না।

প্রজাদের হক

আমরা অনেকে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য লালায়িত। গদি পাওয়ার জন্য সবকিছু করতে রাজি। কিন্তু এটা যে কত বড় বোঝা তা উপলব্ধি করলে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নির্বাচন করা তো দূরের কথা, জোর করে কেউ ক্ষমতায় বসিয়ে দিলেও নেয়ার জন্য রাজি হতাম না। সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে,

فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته.

অর্থ : যিনি আমীর তথা রাষ্ট্রপ্রধান তিনি রাষ্ট্রের সকলের তত্ত্বাবধায়ক। জনগণ সম্পর্কে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। (হা.নং ৭১৩৮)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রাষ্ট্রপ্রধানকে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। তার অধীনস্ত কোন মানুষ না খেয়ে মারা গেলে তারও কৈফিয়ত দিতে হবে। অধীনস্তদেরকে দীনের উপর চালানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে কিনা সে ব্যাপারেও জবাবদিহী করতে হবে। বোঝা গেল, পদ যত বড় হবে তার দায়িত্বও তত বেশি হবে। পদ কোন হালকা বিষয় নয়। হযরত উমর ফারূক রাযি. খলীফাতুল মুসলিমীন ছিলেন। দায়িত্বের চিন্তায় তার ঘুম আসত না। মানুষের আসল অবস্থা জানার জন্য রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে জনগণের প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, আমার রাষ্ট্রের অধীনে, আমার সীমানার মধ্যে একটা কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় তাহলে সে ব্যাপারেও আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বোঝা গেল, পদ এত সহজ বিষয় নয়। মানুষ পদের দায়িত্বের দিকে খেয়াল করে না। বরং পদকে নিজের দুনিয়া গোছানোর সুযোগ হিসেবে দেখে থাকে। তাই সামান্য একটা চেয়ারম্যান আর মেম্বরের পদের জন্যও মানুষ কোটি কোটি টাকা অবলীলায় খরচ করতে দ্বিধাবোধ করে না। আগের যুগে বুযুর্গানে দীনের এমন অবস্থা ছিল যে, তাদেরকে পদ নেয়ার জন্য চাবকানো হত, অত্যাচার করা হত, তবুও তারা পদ গ্রহণ করতেন না। ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ.কে দেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। তাকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, জল্লাদ দিয়ে প্রহার করা হয়েছে, তারপরও তিনি পদ গ্রহণ করেননি।

(৩৫নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রযুক্তির বাঁধভাঙ্গা সয়লাব : দীন ও ঈমান হিফাযতে যত্নবান হোন

মাওলানা মাহমূদুল আমীন

আজকের পৃথিবী প্রযুক্তিময়। মানুষের জীবন প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে প্রযুক্তির ছোঁয়ায়। মোবাইল, কম্পিউটার , টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি এখন জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এ সকল আধুনিক প্রযুক্তিতে স্বল্পতম সময়ে সংবাদ আদান-প্রদানসহ নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে । তবে উপকারিতার তুলনায় এগুলোতে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। ডাক্তারের ছুরি জীবন রক্ষার উপায় আর ডাকাতের ছুরি জীবন বিনাশের মাধ্যম। ঠিক তেমনি প্রযুক্তির লাভ-ক্ষতি এর ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। দুঃখজনক হলেও সত্য, এসকল প্রযুক্তি আজ চরম অপব্যবহারের শিকার। মোবাইল ইন্টারনেটের বল্গাহীন ব্যবহারে বর্তমানে পরিবার ও সমাজে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একটি শিশু স্বচ্ছ, কোমল ও পবিত্র হৃদয় নিয়ে ধরার বুকে আগমন করে। পিতা-মাতার আখলাক চরিত্র ও ঘরের পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করতে থাকে। পিতা-মাতার সুন্দর চরিত্র ও ঘরের নূরানী পরিবেশ যেমন তার দিলের শুভ্রতাকে উজ্জ্বলতর করতে থাকে তেমনি বড়দের মন্দ-চরিত্র ও ঘরের গান্দা পরিবেশ তার দিলকে কদর্য ও কলুষিত করে দেয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিটি সন্তানই দুনিয়াতে ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায় অথবা খ্রিস্টান বানায় অথবা অগ্নিপূজক বানায়। (সহীহ বুখারী; হা.ন. ১৩৮৫, সহীহ মুসলিম; হা.ন. ৬৯২৬)

জন্মের পর এখনকার শিশুরা কুরআনের অপার্থিব সুর লহরী নয় শোনে অবৈধ বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার। হাসপাতালের বেডে কিংবা ঘরের বিছানায় নবজাতক শুয়ে আছে আর তার কক্ষেই হয়তো চলছে টিভির নৃত্য-গীত কিংবা মোবাইলের অশুভ সঙ্গীত। তাকে কোলে নিয়ে এমনকি দুগ্ধদানকালেও হয়তো তার জননী তাকিয়ে আছে টিভির পর্দায়। ঘরে বাবা মা ও বড়রা টিভি দেখে, সিনেমা দেখে, সিরিয়াল দেখে, মোবাইল-ফেসবুকে ব্যস্ত থাকে। তাদের দেখে দেখে শিশুরাও টিভি, সিনেমা ও মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ে। এতে শিশুদের হৃদয়ের পবিত্র ভূমিতে বপিত হয় গুনাহের বীজ। স্মার্টফোনের কল্যাণে শৈশবের কোমলতা হারিয়ে সে হয়ে ওঠে ভিডিও গেমসে স্মার্ট, ছবি ও সেলফি তোলায় এক্সপার্ট। বলা হয় মায়ের কোল শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। সেখানে সে সততা, নৈতিকতা ও দীনদারীর সবক পাবে। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস!! সে শিক্ষালয়ে আজ টিভিপর্দার মারামারি আর নির্লজ্জ নৃত্যঝঙ্কারে গজবের পরিবেশ বিরাজিত। টিভি-মোবাইলে গান শুনে শুনে শিশু নিজেও গাইতে চায়, নাচ দেখে সে-ও নাচতে চায়, মাস্তানী দেখে দেখে সে-ও মাস্তানী করতে চায়। নায়ক, গায়ক ও মাতালের অভিনয় দেখে সেও নায়ক, গায়ক, মাতাল হতে চায়। তাই তো আজ লাখো তরুণ-যুবক মাদকের মরণ-নেশায় মত্ত। দীন ও নৈতিকতা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিছিন্ন । আজ শিশুদের কোমল কণ্ঠে কুরআনের আসমানী সুর লহরী নয়; বাজে গানের কলি। কুরআন বুকে শিশু মসজিদে নয়; গীটার কাঁধে গান শিখতে যায়। শিশুর মুখে সূরা-কালিমা নয়, কিছু অর্থহীন কবিতা কিংবা দু-চারটি ইংরেজি শব্দে মা-বাবারা আহ্লাদিত হয়ে ওঠে।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত(?) পরিবার ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৈশোর পেরোনোর আগেই শিশুরা বড়দের দেখে দেখে ফেসবুক, গুগল ও টুইটারের সন্ধান পেয়ে যায়। আর তারুণ্যের বেলাভূমিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকে প্রযুক্তির নেশায়। অশ্লীল আকাশ-সংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবলে নেমে আসে চারিত্রিক চরম অবক্ষয়। ফেসবুক, ইউটিউবের চিত্তহারী আহ্বান তার জীবন-যৌবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়। একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্ট-

'মোবাইলের কারণে কিশোর-কিশোরী ও তরণ-তরুণীদের মধ্যে ফেসবুক নেশা এখন সর্বাধিক। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের মোবাইল আসক্তি হাজার হাজার পরিবারকে ফেলেছে দুর্ভাবনায়। হঠাৎ চালু হওয়া 'মোবাইল সংস্কৃতি' বুঝতে শেখার আগেই ফেসবুক, গুগলে উলঙ্গ বেলেল্লাপনা ছবির ছড়াছড়ি তরুণ-তরুণীদের কচি মন বিগড়ে দিচ্ছে। চরিত্র গড়ার আগেই নষ্ট হচ্ছে কিশোর-কিশোরীর চরিত্র। নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে লেখাপড়ায় এবং পরিবার-সমাজে। জীবন গঠনের আগেই নতুন প্রজন্ম হারাচ্ছে পথের দিশা। বাবা-মায়ের ভাষায়, অপরিণত বয়সে ছেলে-মেয়েরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিষিদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সহজাত প্রবৃত্তির কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বইয়ের বদলে মোবাইলের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির সুবিধায় ডিজিটালের নামে আগামী প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার রহস্য কী?। ...মোবাইল ও ফেসবুক যুগের আগে ছেলে মেয়েরা রাতে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ত। এখন মোবাইল টিপতে টিপতে ঘুমিয়ে পড়ে। ব্লগ, ফেসবুক ও টুইটার ব্যবহারের কারণে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে পড়েছে মোবাইল। দ্রুত যোগাযোগে মোবাইল আশীর্বাদ হলেও অনেকের জন্য হয়েছে সর্বনাশ...। ঢাকার একটি নামকরা কলেজের প্রায় তিনশ ছাত্র গত সপ্তাহে শিক্ষা সফরে কক্সবাজারে যায়। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেলো, প্রত্যেক ছাত্রের হাতে দুই-তিনটি করে মোবাইল, সবার কানে হেডফোন। শিক্ষকদের সামনেই ছাত্রদের কেউ ফোন টিপছে, কেউ গান শুনছে, কেউ ফোনে গেম খেলছে। তিনশ ছাত্রের মধ্যে মাত্র দুই-তিনজনের হাতে বই দেখা গেল। অথচ কয়েক বছর আগেও চিত্র ছিলো উল্টো। ভবিষ্যতের জীবন গঠনে বই যাদের নিত্যসঙ্গী হওয়ার কথা তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে মোবাইল। (স্টালিন সরকার; দৈনিক ইনকিলাব, ২রা মার্চ ২০১৬)

মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদির কারণে ভেঙ্গে যাচ্ছে অনেক ঘর, অশান্তির অনলে পুড়ছে মায়ার সংসার। স্বামী বা স্ত্রীর চাইতেও বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে ফেসবুকি বন্ধু বা বান্ধবী। পরকীয়ার মত জঘন্য ঘটনা ঘটে চলেছে অহরহ। একাধিক সন্তান রেখে ফেসবুকি বন্ধুর হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার কিংবা পরকীয়ার স্বাক্ষী নিঃশেষ করার জন্য জন্মদানকারী মা কর্তৃক নিজ হাতে সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করার হৃদয়

বিদারক ঘটনাও ছাপা হচ্ছে পত্রিকার পাতায়। জন্ম হচ্ছে আজ ঐশীদের মত হন্তারকদের যারা বন্ধুর টানে আপন মা-বাবার খুনের নেশায় মেতে উঠছে। মোবাইলের মাধ্যমে হুমকি, চাঁদাবাজিসহ নানাবিধ অপরাধ প্রবণতা তো রয়েছেই। এককথায় প্রযুক্তির ভয়াল ছোবলে আজ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে করণীয়

আধুনিক প্রযুক্তির বিষাক্ত ছোবল থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে-

১. টিভি-মোবাইল জাতীয় সকল প্রযুক্তি শিশুদের থেকে দূরে রাখতে হবে। ঠিক যেমন সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হয়। শিশুদেরকে কোন ধরনের ভিডিও, ভিডিও কার্টুন, গেম ও নাচ-গান ইত্যাদি একেবারেই দেখানো যাবে না। অভিভাবকগণ নিজেরাও এসব দেখবে না এমনকি বাসায় আগত স্মার্ট ফোন ইত্যাদি বহনকারী মেহমানকেও সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিবে, তারা যেন শিশুদেরকে এগুলো না দেখায়। অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে ছাত্র অবস্থায় কিছুতেই মোবাইল কিনে দিবে না। অন্য কোনভাবেও সে যেন মোবাইল ব্যবহার করতে না পারে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

উল্লেখ্য, ছোটদেরকে কোন গুনাহের কাজের সুযোগ করে দেয়া হলে তাদের খাতায় গুনাহ লেখা না হলেও সুযোগদাতা অভিভাক অবশ্যই গুনাহগার হবে। অভিভাবকদের সহায়তায় কিংবা তাদের শিথিলতায় শিশুদের চরিত্র নষ্ট হয়ে মনমানিসকতা গুনাহপ্রবণ হয়ে গেলে এর পুরো দায়ভার অভিভাবকদের উপরই বর্তাবে। একটু সতর্ক হলে যে হতো মা-বাবা ও অভিভাবকদের জন্য সদকায়ে জারিয়া সে-ই তখন হয়ে যাবে গুনাহে জারিয়া। কিয়ামতের ময়দানে যখন বিপথগামী এসব সন্তানেরা ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হবে তখন তারা ক্ষোভে-দুঃখে অভিভাবকদেরকে পায়ের নিচে পিষে ফেলতে চাইবে। (সুরা হা-মীম সাজদা- ২৯) তারা এসকল অভিভাবকদের জন্য বদ-দু'আ করবে, হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের উপর মহাঅভিসম্পাত নাযিল করুন। (সূরা আহযাব- ৬৪)

২. প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বিশেষ করে চোখ ও কানের হিফাযত অত্যন্ত জরুরী। বেগানা কারো ছবি দেখা ও গান-বাদ্য শোনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। বেগানাদের কণ্ঠের হামদ-নাত এমনকি কুরআন তিলাওয়াতও শোনা যাবে না। মনে রাখতে হবে, আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি সব আল্লাহর দেয়া আমানত। এই আমানতের খেয়ানত করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই চোখ, কান ও হৃদয় এই প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৬) অন্য আয়াতে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিসমূহের খেয়ানত সম্পর্কে খুব ভালো করে জানেন। (সুরা মুমিন- ১৯) সুতরাং জবাবদিহিতার ভয় অন্তরে নিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অযাচিত কোন দৃশ্য যেন সামনে না আসে এর জন্য অ্যাডব্লক, পর্নোব্লক ও ইমেজব্লক ইত্যাদি সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হবে। মোবাইল রিংটোনটি যেন মিউজিক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. প্রাণীর ছবি ও সেলফি তোলাসহ যাবতীয় শরীয়ত গর্হিত কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে শরীয়ত অনুমোদিত প্রয়োজন ছাড়া ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম। যে ছবি তোলে তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়। তাকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে (নাউযুবিল্লাহ)। অনেকে শখ করে ছোট শিশুদের ছবি তোলে ও স্ক্রীনে সেভ করে রাখে, এটা মারত্মক গুনাহের কাজ। ক্যামেরাওয়ালা মোবাইলের সুবাদে আজ মুসলমান ব্যাপকভাবে এই মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত হয়ে অভিশপ্ত হয়ে পড়ছে।

৪. অপ্রয়োজনীয় ও অধিক কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা অপ্রয়োজনীয় ও অধিক কথা বলা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। কলরেট কম বা ফ্রি বলেই অযথা কথা বলা জায়েয হয়ে যায় না। আমাদের মুখ থেকে যে কথাই উচ্চারিত হয় তা সাথে সাথেই একজন ফেরেশতা সংরক্ষণ করে ফেলেন। (সূরা ক্বাফ- ১৮) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অধিকাংশ মানুষ মুখের কারণে অধঃমুখো হয়ে জাহান্নামে যাবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.ন. ২৬১৬)

৫. অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করা যাবে না। অপ্রয়োজনে প্রযুক্তির ব্যবহারে দু'টোরই অপচয় হয়। অথচ কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা সময় ও অর্থ ব্যবহারের হিসাব চাইবেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত তার পা নিজ স্থান হতে সরাতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে, যৌবন কোথায় শেষ করেছে, সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে। ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৪১৬) হাশরের ময়দানের হিসাবের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

৬. প্রযুক্তির ব্যবহার যেন আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর ইবাদত থেকে গাফেল করে না দেয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। মোবাইল-ইন্টারনেটের ব্যবহার যেন অন্যের কষ্টের কারণ না হয় সেদিকেও খুব খেয়াল রাখতে হবে। অনেকে বিকট শব্দের রিংটোন বাজিয়ে বা জোরে জোরে কথা বলে কিংবা অসময়ে ফোন করে অন্যকে কষ্ট দেয়, অথচ অন্যকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।

দীন প্রচারে প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমানে দীন প্রচার ও বাতিল প্রতিরোধের নামে ফেসবুক ও ইন্টারনেট ব্যবহারে হিড়িক পড়েছে। তাকওয়া-তাহারাত ও ইলমী-আমলী মযবুতি ছাড়াই প্রযুক্তির মাধ্যমে দীন প্রচারে নেমে নিজের দীনদারীকেই বিকিয়ে দিচ্ছে অসংখ্য আলেম, তালেবে ইলম। একজন বিজ্ঞ আলেম বড় মূল্যবান কথা বলেছেন, গভীর পানিতে স্বর্ণের হার পড়ে গেছে, হারটি পানি থেকে উঠানো প্রয়োজন; কিন্তু তুমি সাঁতার জানো না। এরপরও কি হারটি উদ্ধারের জন্য তুমি পানিতে নেমে পড়বে? যদি হার উঠানোর জযবায় সাঁতার না শিখেই তুমি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো, তাহলে হারটির সাথে সাথে তোমার জীবনেরও সলিল সমাধি ঘটবে।

এই মূল্যবান উপমাটিই আমাদের তলাবা ও নবীন আলেমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যারা দীন প্রচারের জযবায় প্রযুক্তির দরিয়ায় নিজেরাই আত্মাহুতি দেয়। সন্দেহ নেই দীনের প্রচার প্রসার ফরয যিম্মাদারী। কিন্তু যেখানে দীন প্রচার করতে গেলে খোদ প্রচারকের দীনদারীই বিদায় নেয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে সেখানে দীন প্রচারের এই জযবার লাগামকে কষে টেনে ধরা ফরয। আমাদের যদি দীন প্রচারের এতই জযবা থাকে তাহলে নবীওয়ালা পদ্ধতিতে

(৩২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

খেলাধুলার শরয়ী বিধান

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। আকরাম খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কেনিয়াকে হারিয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হল। দেশব্যাপী সে কী আনন্দ-উল্লাস! সে কী রঙ মাখামাখি! রাস্তায় বেরিয়ে সেদিন ‘রংবাজ’দের কবলে পড়েনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া ভার। পুরো দেশ যেন ক্রিকেট-নেশায় মাতাল। সে দিনের আনন্দ-উল্লাস যে আজকের দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশের পটভূমি হবে তা বোঝার সাধ্য কার ছিল!

মুহাম্মদপুরের বাসিন্দা হওয়ায় আবাহনী মাঠ হয়ে প্রায়ই এদিক সেদিক যাওয়া হয়। বিকেল তিনটার পর থেকে মাঠটি সরগরম হতে থাকে। পাঁচ থেকে পঁয়ত্রিশ বিভিন্ন বয়সের ক্রিকেটপ্রেমীদের তরঙ্গ সৃষ্টি হয় মাঠ জুড়ে। সকলেই ব্যাট-বল হাতে প্র্যাক্টিসে মত্ত। জানা গেছে, এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। তাদেরকে দক্ষ কোচ দ্বারা প্র্যাক্টিস করানো হয়। দৈনিক আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা প্র্যাক্টিসের নিয়ম রয়েছে। ভর্তি ফি চার হাজার টাকা। মাসে মাসে নেয়া হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোচিং ফি। বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে সাধারণত তাদের মায়েরা। মায়ের আদরের ধনটি যখন প্র্যাক্টিস করে মা তখন বেঞ্চিতে বসে পা দোলান। কল্পনায় সন্তানের ভবিষ্যতের ছবি আঁকেন। সাঙ্গাকারা, টেন্ডুলকার, মালিঙ্গা, সাকিব আল হাসান কত্তো ছবি জমা হয় তার বুকে!। বলের পশ্চাতে সন্তানের প্রতিটি পিটুনিতে মায়ের স্বপ্নের ভিত মজবুত হতে থাকে– বিশ্বজোড়া খ্যাতি, ৩০০ কোটি প্লাস ব্যাংক-ব্যালেন্স, আরো কত্তো কী!

খেলা নিয়ে এই যে উন্মাদনা এর পেছনে রয়েছে মিডিয়ার ব্যাপক অনুদান। কেউ যখন দেখে একটা ছক্কা হাঁকলেই হাজার হাজার টাকা পুরস্কার, সেঞ্চুরি করলে লক্ষ টাকার হাতছানি, তখন বৈষয়িক উন্নতিকামীরা আর কীভাবে নিশ্চেষ্ট বসে থাকে। তারা দেখে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বাৎসরিক আয় আশি মিলিয়ন ডলার, মেসির আয় তেহাত্তর মিলিয়নেরও বেশি। বড় বড় ঘাগু বিজনেস-ম্যানরাও বহু কষ্টের পর যা কামাতে পারে না। তাহলে এমন সফল পেশা গ্রহণ না করার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে! ইদানিং আবার এ শ্রেণীটির মনের প্রসাদরূপে বাজারজাত করা হয়েছে বিপিএল টুর্নামেন্ট। বিপিএলে একেকজন খেলোয়াড়কে কেনা হয় কোটি টাকা খরচ করে। আর ম্যাচ প্রতি ভিন্ন ফি লক্ষ লক্ষ টাকা তো আছেই। গরিবরা এসব দেখে দেখে স্বপ্ন বুনে। বিত্তবানরা সন্তানকে নিয়ে যায় ক্লাব ও ক্রীড়া কোচিং সেন্টারে।

খেলাধুলার পাশাপাশি বর্তমানে খেলা দেখার প্রবণতাও বেড়েছে ব্যাপক হারে। গত বিপিএলের ৩৪ ম্যাচে মাঠের দর্শকই ছিল সাত লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার। পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে টিভির সামনে জটলা পাকানোদের তো হিসেবই নেই। কী বুড়ো, কী শিশু–গোল-ছক্কায় কেউ চেঁচাতে ভুল করে না। এখন পুরো দেশটাই যেন খেলার মাঠ, মানুষগুলো সব খেলোয়াড়। আর খেলাধুলাই জীবনের চরম লক্ষ্য, খেলাধুলাই জীবন।

খেলাধুলার প্রাচীন রূপ

খেলাধুলা আমাদের সমাজে নতুন কিছু নয়, আগেও ছিল। কিন্তু এখনকার উগ্র উন্মাদনা সেকালে ছিল না। বয়স্ক পাঠকগণ অবগত আছেন– সেকালে ঈদসহ বিভিন্ন পালা-পর্বণে পাড়ার ছেলেরা বাড়ি আসতো। বহু দিনের অদেখা বন্ধুদের কাছে পেয়ে জমে উঠতো আড্ডা-মাস্তি। কথায় কথায় কেউ একজন বলতো, আর কয়েকটা দিন বাড়ি আছি, এর মধ্যে ছোটখাটো একটা টুর্নামেন্ট দেয়া যায় না! ব্যস, শুরু হয়ে গেল টুর্নামেন্ট, কয়েক দিনের মৌজ-মাস্তি, হৈ-হুল্লোড়। এরপর আবার সবাই যার যার কর্মস্থলে। অর্থাৎ একসময় খেলাধুলা ছিল অবসরের সীমিত বিনোদন। ক্রীড়া শব্দটির সৃষ্টিও মানুষের এই সরল অনুভূতি থেকে। শব্দটি এসেছে প্রাচীন ফরাসী শব্দ ডিস্পোর্টস অর্থাৎ অবসর থেকে। বস্তুত অতীতে খেলা কোন পেশা ছিল না এবং মানুষ এমন ‘অর্থ’হীন কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কল্পনাও করতো না। খেলাধুলা ছিল তখন সাময়িক চিত্তবিনোদনের উপাদান; কাজের ক্লান্তি ও কর্মযজ্ঞের একঘেয়েমি দূর করার উপায়। কালক্রমে খেলাধুলা পেশার রূপ ধারণ করে এবং মানুষের বিনোদনের নির্মল আবহকে নষ্ট করে দেয়। কারণ অভিভাবক যখন তার বাচ্চাটিকে ক্রীড়া কোচিং-এ ভর্তি করেন তখন সে নিজের মতো করে খেলাধুলার পরিবর্তে বিভিন্ন নিয়ম মেনে খেলতে বাধ্য হয়। ফলে সে খেলার নির্মল আনন্দ লাভে ব্যর্থ হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য নিয়মতান্ত্রিকতার আবহ থেকে মুক্তি লাভের যে আশা তার মনে জেগেছিল তা দুরাশাই রয়ে যায়। বাংলা উইকিপিডিয়ায় এ বিষয়ে সুন্দর একটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, ‘এককালে খেলাধুলার মূল উদ্দেশ্যই ছিল চিত্তবিনোদন। কিন্তু গণমাধ্যম অবসর কাটানোর উপায়কে পেশায় রূপান্তরিত করেছে। ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে অর্থ উপার্জনই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেশাগত খেলায় বিনোদন নয় বরং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া এবং ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা প্রাচীন রীতি-নীতি হিসেবে ক্রীড়াচর্চার নির্মল বিনোদনকে নষ্ট করে দিচ্ছে।’ (Wikipedia.org)

খেলাধুলার ইসলামী দর্শন

বাংলা উইকিপিডিয়ায় খেলাধুলার ইতিহাস আলোচনায় বলা হয়েছে, ‘চীনের নাগরিকেরা খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগে থেকে খেলাধুলার সাথে জড়িত।’ কিন্তু মানুষের সত্তাবৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ক্রীড়া-কৌতুক মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। শিশু যখন কথা বলতে শিখেনি তখনো সে মায়ের আঁচল নিয়ে খেলতে জানে। এতে বোঝা যায়, যেদিন থেকে মানুষের সৃষ্টি সেদিন থেকেই বিনোদনের সূচনা। ইসলাম যেহেতু স্বভাবধর্ম, তাই খেলাধুলার বিনোদনকে সে অস্বীকার করেনি। বরং এর জন্য কিছু মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে। ইসলাম বলে, খেলাধুলা মানবজীবনের মূল লক্ষ্য এবং চূড়ান্ত কাম্য বস্তু হতে পারে না। মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তার

হুকুম-আহকামের পাবন্দির মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা। সুতরাং খেলাধুলা কিছুতেই আল্লাহর হুকুম পালনে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। বরং কর্মের একঘেয়েমি যেন মানবমনকে বিষাদগ্রস্ত না করে এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি অনীহা সৃষ্টি না করে ইসলাম এ উদ্দেশ্যে খেলাধুলাকে বৈধতা দিয়েছে। ইসলামী দর্শনে খেলাধুলা নিছক খেলার জন্য নয়; প্রফুল্ল মনে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্য। বিনোদনের প্রশ্নে ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির এটাই পার্থক্য। অন্যান্যদের দৃষ্টিতে নিছক খেলার জন্য খেলাধুলা করা দোষের কিছু নয়। বিনোদনের জন্য বিনোদন তাদের দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য। এর জন্য তারা আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননার ব্যবস্থা পর্যন্ত রেখেছে। ইসলাম বলে, যে খেলা ও বিনোদন শুধুই বিনোদনের জন্য তা অবৈধ এবং যে খেলার মত্ততায় মানুষ উন্মত্ত হয়ে দীনবিমুখ হয়ে যায় তা হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ.

অর্থ : তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যখন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে, তাদের অন্তর থাকে খেলায় মত্ত। (সূরা আম্বিয়া- ২, ৩)

মুমিনের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.

অর্থ : আর তারা ঐ সকল ব্যক্তি যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে। (সূরা মুমিনূন- ৩)

অন্যত্র বলেন, যদি তারা অনর্থক কথা-কাজের সংশ্রবে গিয়ে পড়ে তাহলে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যায়। (সূরা ফুরকান- ৭৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষের সুন্দর ইসলাম হল, সে অনর্থক বিষয়াবলী পরিহার করবে।'

খেলাধুলা এবং বিনোদন যখন জীবনের লক্ষ্য হবে এবং ব্যক্তিকে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিমুখ করে তুলবে তখন তা অনর্থক কাজ বলে গণ্য হবে। কারণ, শরীয়তের পরিভাষায় অনর্থক কাজ তা-ই যা মানুষকে লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী থেকে অমনোযোগী করে দেয়। উদ্দেশ্যবিহীন খেলা শরীয়তের পরিভাষায় খেল-তামাশা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ.

অর্থ : বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেল-তামাশা থেকে অনেক উত্তম। আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা। (সূরা জুমু'আ- ১১)

সাহাবায়ে কেরাম খেলাধুলা করতেন। কিন্তু খেলাধুলা তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারত না। ইমাম বুখারী রহ. সংকলিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আদাবুল মুফরাদ' এর হাদীসটি লক্ষ্য করুন,

كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال.

অর্থ : সাহাবায়ে কেরাম খরবুজা নিয়ে লোফালুফি করতেন। কিন্তু যখন দীনের কোন প্রসঙ্গ আসত, মনে হতো তারা এ ময়দানেরই লোক (খেলাধুলার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই)। (আল-আদাবুল মুফরাদ; হা.নং ২৬৬)

হাদীসের পাতায় খেলাধুলা-বিনোদন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'তিনি ধর্মের মাঝে তোমাদের উপর কোন সঙ্কীর্ণতা রাখেননি। (সূরা হজ্জ- ৭৮) হাদীসের ভাষ্যে কুরআনের এ বাণীর প্রচ্ছন্নতা প্রস্ফুটিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. صححه الالباني.

অর্থ : হে হাবশী বালকেরা! তোমরা খেলাধুলা করো, যেন ইহুদী নাসারা জানতে পারে, আমাদের ধর্মে প্রশস্ততা রয়েছে। (মুসনাদে হারেস; হা.নং ৮৫৫)

অন্য হাদীসে এসেছে,

الهوا والعبوا فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة. قال البيهقى: هذا منقطع.

অর্থ : (বৈধ) খেলাধুলা করতে পারো। কেননা আমি তোমাদের ধর্মে কঠোরতা করতে পছন্দ করি না। (শুআবুল ঈমান; হা. নং ৬৫৪২)

হযরত আলী রাযি. বরেন,

أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان.

অর্থ : হৃদয়কে প্রশান্ত কর এবং এর জন্য কৌশল অবলম্বন কর। কেননা মন তেমনই ক্লান্ত হয় যেমন শরীর ক্লান্ত হয়। (জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম- ৪০৮)

হযরত কাসামাহ ইবনে যুহাইর বলেন,

روحوا القلوب ساعة فساعة.

অর্থ : অন্তরকে মাঝে মধ্যে প্রফুল্ল কর। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহ; হা.নং ৪৮৩)

শরীয়তে নিষিদ্ধ খেলা

কিছু খেলার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তার বিবরণ তুলে ধরা হল।

১. জুয়া : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : হে মুমিন সকল! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারো। (সূরা মায়িদা- ৯০)

২. পাশা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.

অর্থ : যে ব্যক্তি পাশা খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৯৪০)

অন্য হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি পাশা খেলল, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্ত, মাংস দ্বারা রাঙিয়ে নিল। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৬০)

পাশার সাথে লুডুর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে, তাই এমন খেলা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

৩. দাবা : হযরত আলী রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التى انتم عاكفون؟

অর্থ : হযরত আলী রাযি. কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা দাবা খেলায় মত্ত ছিল। তিনি (অসন্তুষ্ট হয়ে) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এগুলো কিসের মূর্তি যেগুলোর প্রতি তোমরা ঝুঁকে আছো?

ইমাম মালেক রহ. বলেন, দাবা খেলা পাশা খেলার মধ্য থেকে। (আসসুনানুস সুগরা লিলবাইহাকী; হা.নং ৪৬৫১)

ইমাম ইবনে কুদামা রহ. বলেন, দাবা খেলা হারাম হওয়ার দিক দিয়ে পাশা খেলার মতই। তবে পাশা খেলা হারাম হওয়ার বিষয়টি অধিক শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যারা দাবা খেলা হারাম মনে করেন তাদের কয়েকজনের নাম কাযী আবূ হুসাইন উল্লেখ করেছেন।

তারা হলেন, আলী ইবনে আবী তালেব রাযি., ইবনে উমর রাযি., ইবনে আব্বাস রাযি., সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব এবং আরো অনেকে। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-ও দাবা খেলা হারাম হওয়ার কথা বলেছেন। (আলমুগনী ১২/৩৬)

৪. মোরগ, ষাড়ের লড়াই : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণীদের লড়াতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী শরীফ: হা. নং ১৭৬১)

৫. কবুতরবাজী : কিছু লোকের কবুতরের প্রতি অত্যধিক নেশা থাকে। অন্যের কবুতর চুরি করা, যার তার ছাদে উঠে যাওয়া ইত্যাদি অন্যায় কাজ তারা নিত্যই করে থাকে। হাদীসে এ ব্যাপারে সতর্কতা এসেছে। বর্ণিত হয়েছে,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وراء حمام فقال شيطان يتبع شيطانة.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পেছনে দৌড়াতে দেখে বললেন, এক শয়তান আরেক শয়তানের পেছন পেছন যাচ্ছে। (আল আদাবুল মুফরাদ: হা. নং ১৩০০)

অন্যান্য খেলাধুলার শরয়ী বিধান

পূর্বের আলোচনায় কুরআন-হাদীসে যে সকল খেলাধুলার স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খেলাধুলার বৈধ-অবৈধের বিষয়টি মৌলিক কয়েকটি নীতিমালার উপর আবর্তিত।

(১) যে খেলাধুলা কোন হারাম এবং গুনাহের কাজ সংবলিত, সে খেলা নাজায়েয। যেমন কোন খেলায় সতর খোলা হয়, কিংবা তাতে জুয়াবাজি থাকে, কিংবা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয়, অথবা তাতে গান-বাদ্যের আয়োজন থাকে, বা যে খেলায় কাফেরদের অনুসরণ করা হয়।

(২) যে খেলাধুলা ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদির ব্যাপারে উদাসীনতা সৃষ্টি করে, সে খেলাধুলা নাজায়েয। কেননা যে কাজ মানুষকে তার ফরয, ওয়াজিব দায়িত্ব থেকে উদাসীন করবে তাই 'অনর্থক' কাজের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর ৬০০৩নং হাদীসের শিরোনামে বলেছেন,

كل لهو باطل اذا شغله عن طاعة الله.

অর্থ : যে ক্রীড়া আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন করে তা নাজায়েয। হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

ان المنهى عنه ما فيه افراط اومداومة عليه ما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين.

অর্থ : নিষিদ্ধ বিনোদন হল, যে বিনোদনে সীমালঙ্ঘন করা হয় বা ধারাবাহিক চলতে থাকে যার পরিণতিতে আল্লাহর বিধান পালনে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং দীনী বিষয়ে গাফেল প্রমাণিত হয়। (ফাতহুল বারী ১০/৫২৯)

(৩) যে খেলাধুলা উদ্দেশ্যহীন, শুধু সময় কাটানোর জন্য হয়, শরীয়তে সে খেলাও নাজায়েয। কেননা এতে জীবনের মহামূল্যবান সময়কে অনর্থক কাজে নষ্ট করা হয়।

(৪) উপরোক্ত বিষয়গুলোর অনুপস্থিতিতে যদি খেলা দ্বারা দীনী বা দুনিয়াবী কোন উপকার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে খেলা বৈধ হবে।

ইসলামে পছন্দনীয় কয়েকটি খেলা

১. তীর চালনা : তীর চালনা ইসলামে পছন্দনীয় একটি খেলা। কারণ এর মাধ্যমে খেলোয়াড়ের শারীরিক উৎফুল্লতা লাভের পাশাপাশি সে দেশ ও জাতির অনেক কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা অর্জন করে।

২. অশ্ব চালনা : অশ্ব চালনা ইসলামে অতি পছন্দনীয় খেলা। এতে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা অর্জিত হয়।

৩. সাঁতার শেখা বা শেখানো : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشى الرجل بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة.

অর্থ : চারটি জিনিস ছাড়া আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার সাথে সম্পর্ক রাখে না এমন সব কিছুই অনর্থক খেল-তামাশা। (১) নিজ স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করা, (২) নিজের ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, (৩) লক্ষ্যভেদ করার প্রশিক্ষণ নেয়া ও (৪) সাঁতার শেখা। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৮৯৩৯)

অন্য হাদীসে এসেছে,

أحبُّ اللهو إلى الله إجراءُ الخيلِ والرَّمْيِ. قال المناوي: إسناده ضعيف.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় খেলা হচ্ছে অশ্ব চালনা ও তীরন্দাযী। (ইবনে আদী ৬/১৭৬)

এ সকল খেলা যদি উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়, দেশ, জাতি ও ইসলাম রক্ষায় জিহাদের ময়দানে এ যোগ্যতা প্রয়োগের নিয়ত থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র বিবেচিত হবে। হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. বলেন, বর্তমানে তীরন্দাযীর পরিবর্তে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র প্রশিক্ষণ হাদীসের প্রয়োগস্থল হবে, যেমন বন্দুক, কামান ইত্যাদির নিশানা। (বাযলুল মাজহূদ ১১/২৪২)

৪. স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করা : স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং প্রশংসনীয় খেলা। অনেক পরিবারে দেখা যায় স্বামী যখন বাইরে মানুষের সাথে মেলামেশা করে হাস্যোজ্জ্বল থাকে। কিন্তু ঘরে ফিরেই চেহারা কালোমেঘে ছেয়ে যায়, স্ত্রীর সাথে রূঢ় আচরণ করে। রাসূলের শিক্ষা এর বিপরীত। হযরত আয়িশা রাযি. বলেন, 'একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং আমি আগে চলে গেলাম। কিছুদিন পর আরেক সফরে আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, তখন আমি মুটিয়ে যাওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আগে চলে গেলেন এবং মজাক করে বললেন, এটা আগের বারের প্রতিশোধ। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৫৭৮)

৫. দৌড় প্রতিযোগিতা : দৌড় প্রতিযোগিতা ইসলামে পছন্দনীয় একটি খেলা। এতে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক প্রফুল্লতা অর্জিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আয়িশা রাযি. এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। সাহাবাদের থেকেও এরূপ কর্ম পাওয়া যায়।

বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ কয়েকটি খেলা

এক. ক্রিকেট : বর্তমানে বাংলাদেশে ক্রিকেট অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা। সারা বিশ্বে ফুটবলের পরে এ খেলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ খেলায় সময় নষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু লাভের খাতা প্রায় শূন্য। ক্রিকেট ২২ জনের খেলা হলেও এতে মূল খেলোয়াড় বলতে গেলে দুই জনই থাকে। একজন ব্যাটসম্যান, অপরজন বোলার। অনেক খেলায় দেখা যায় এক ব্যাটসম্যানই দুই তিনদিন ধরে খেলতে থাকে, একটি ম্যাচই পাঁচদিন পর্যন্ত

চলতে থাকে। ক্রিকেট খেলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা এবং পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে এতে অংশগ্রহণ করা নাজায়েয। তবে কেউ কাজের অবসরে ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে অল্প সময় খেললে তা নাজায়েয হবে না।

দুই. ফুটবল, হকি, ভলিবল, টেনিস ইত্যাদি : এসব খেলায় যদিও অল্পতে অনেক ব্যায়াম হয়, কিন্তু সতর খোলা রেখে খেলা কিংবা সতর খোলা লোকদের খেলা দেখা দু'টোই হারাম। ব্যক্তিগত পরিসরে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে শারীরিক বা মানসিক প্রফুল্লতা অর্জনের জন্য কেউ এসব খেলায় লিপ্ত হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হবে না।

তিন. ভিডিও গেমস : বর্তমানে খেলাটি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। খেলাটি যদি প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট হয় তাহলে তো কোন অবস্থায়ই বৈধ হবে না। আর প্রাণীর ছবি না হয়ে গাড়ি, হেলিকপ্টার, বিমান, সামুদ্রিক জাহাজ ইত্যাদি চালানো কিংবা নিশানা করার খেলা হলে বা ছবির চোখ, কান এবং মুখ পরিষ্কার বোঝা না গেলে নিম্নোক্ত শর্তের সাথে মানসিক প্রফুল্লতার জন্য তা বৈধ হতে পারে।

(ক) জুয়াবাজি না থাকতে হবে। (খ) নামায কাযা না হতে হবে। (গ) বান্দার হক নষ্ট না হতে হবে। (ঘ) পড়ালেখা ও অন্যান্য জরুরী কাজে ব্যাঘাত না ঘটাতে হবে। (ঙ) সর্বোপরি এর প্রতি অস্বাভাবিক মনোযোগ না থাকতে হবে। (সূত্রঃ খেলধুলা ও বিনোদনের শরয়ী সীমারেখা)

নারী-পুরুষের খেলা

বর্তমানে নারীরা পুরুষদের সবকিছুতে অংশগ্রহণ না করলে নাকি সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু ইসলাম বলে, সৃষ্টিগতভাবেই যখন দু'জনের মাঝে পার্থক্য রয়েছে তখন নারীর উপর পুরুষের কাজের বোঝা রেখে দেয়া নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়; রীতিমত তার উপর যুলুম করা। সৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়ের খেলার মধ্যেও রয়েছে যৌক্তিক পার্থক্য। আর উভয়ের খেলাধুলা নির্ধারিত হবে তার ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে। পুরুষের কর্মক্ষেত্র হল- (১) রাষ্ট্র পরিচালনা, (২) সামাজিক কর্মকাণ্ড, (৩) যুদ্ধ, (৪) বীরত্ব ইত্যাদি। সে হিসেবে তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে তীরন্দাযী, অশ্ব চালনা এবং আধুনিক অস্ত্র চালনার যোগ্যতা অর্জিত হয় এমন খেলা।

অপরদিকে নারীর মূল কর্তব্য যেহেতু ঘরের যাবতীয় বিষয় আঞ্জাম দেয়া, তাই তার জন্য উপযোগী খেলা হল, হাতে বানানো পুতুল খেলা, যাতে বাচ্চা লালন-পালনের যোগ্যতা হয়; চড়ুইভাতি, যাতে রান্না-বান্নার যোগ্যতা হয়, সেলাই শিক্ষা ইত্যাদি। হযরত আয়িশা রাযি. বলেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى صواحبي يلعبن باللعب البنات الصغار.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার সখীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন পুতুল খেলার জন্য। (আল-আদাবুল মুফরাদ; হা.নং ১২৯৯)

তবে কোন নারী যদি বিশেষ কোন জ্ঞানে পারদর্শী হয় তাহলে শরয়ী বিধান এবং পর্দা রক্ষা করে তা করা দোষের কিছু নয়। হযরত আয়িশা রাযি. পর্দার বিধান রক্ষা করে হাদীস শিক্ষাদান করতেন।

ইসলামী ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত

ভারতের ফিকহ একাডেমী তাদের বিশতম ফিকহী সেমিনারে বিজ্ঞ আলেম কর্তৃক পেশকৃত ২৯টি গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করে যে সিদ্ধান্ত জারি করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হল-

(ক) যে খেলা মানুষের জন্য ব্যাপক উপকারী, যার দ্বারা শক্তি অর্জিত হয়, উদ্যম এবং প্রফুল্লতা লাভ হয় তা বৈধ। শর্ত হল, তা শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয়াদি হতে মুক্ত হতে হবে, দীন ও দুনিয়াবী দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হতে পারবে না এবং কারো কষ্টের কারণ হতে পারবে না।

(খ) সাধারণ অবস্থায় নারী-পুরুষের পর্দার যে বিধান রয়েছে খেলোয়াড়দের জন্যও তা রক্ষা করা আবশ্যক।

(গ) যে ধরনের খেলাধুলার ব্যাপারে হাদীসের উৎসাহ প্রদান পাওয়া যায় এমন খেলা মুস্তাহাব। এছাড়া প্রচলিত অন্যান্য খেলাধুলায় উল্লিখিত মূলনীতিগুলো অনুসরণ করা হলে সে সব খেলাও বৈধ হবে।

(ঘ) খেলার জয়-পরাজয়ে পুরস্কারের অর্থ যদি এক পক্ষ থেকে হয় অথবা তৃতীয় কোন পক্ষ বিজয়ী দলের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করে তাহলে এ পুরস্কার শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। আর যদি উভয় পক্ষ থেকে হয় তাহলে বৈধ হবে না।

(ঙ) সময় মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এ কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন সব খেলা মাকরূহ যা খেলতে বা দেখতে গিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সময় নষ্ট হয়। যদিও সে খেলা পদ্ধতিগত এবং খেলোয়াড়দের লেবাস-পোশাকের বিচারে হারাম মুক্ত হয়।

(চ) যে ধরনের খেলা খেলতে শরীয়তে বাঁধা নেই তা দেখতে এবং দেখার জন্য টিকেট কিনলে নাজায়েয হবে না।

(ছ) যে ব্যক্তি খেলায় অংশগ্রহণ তো করেনি কিন্তু কোন পক্ষের জয়ী হওয়ার উপর অর্থের বিনিময়ে বাজি ধরল তাহলে এ অর্থ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম হবে।

(জ) সীমিত বিনোদনের জন্য খেলাধুলা জায়েয হলেও খেলাধুলাকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়া জায়েয নেই। তদ্রূপ শিক্ষা-দীক্ষা এবং অর্থ উপার্জনের বৈধ পন্থা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে খেলাধুলার জন্য সীমাবদ্ধ করে ফেলা অনুচিত কাজ। (তাফরীহাত ও ওয়াসায়েল আওর উনসে মুতাআল্লিক শরয়ী আহকাম)

ধ্বংস্তপে বিনোদনের ফুরসত কোথায়?

যুগশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর লেখায় পড়েছিলাম, কোন জাতির ধ্বংসের পিছনে সবচেয়ে বেশি যে কারণগুলো দায়ী তার মধ্যে একটি হল, জাতির অত্যধিক বিনোদনপ্রিয় হওয়া। মানুষ সীমাতিরিক্ত বিনোদনমুখী হলে তার পরকাল তো ধ্বংস হয়ই; পার্থিব উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রেও চরম অবনতির শিকার হয়। আজকের যুগে মুসলিম উম্মাহ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, নানামুখী ষড়যন্ত্রের অক্টোপাসে আবদ্ধ, তারা নিজের কর্তব্য নির্ধারণে দিশেহারা, তাদের কর্তিত মস্তক আর রক্ত অন্যের খেলার সামগ্রীতে পরিণত– সেই মুসলমান খেলা আর বিনোদনে উন্মাতাল হয়ে উঠে কীভাবে– বিবেকবান মানুষের কাছে আজ তা বড় প্রশ্ন। ঘরদোর পুড়ে ছারখার যার সে যখন বিনোদনের আফিম খেয়ে ব্যাট-বল আর ফুটবলের তামাশা নিয়ে উন্মাতাল, ধ্বংস তার অবধারিত।

লেখক : মুদাররিস, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্স, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিতর নামাযের রাকাআত সংখ্যা

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

প্রশ্ন : বিতরের নামাযের রাকাআত সংখ্যা নিয়ে ইদানিং কিছু লোক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাদের বক্তব্য হল, সহীহ হাদীসের আলোকে বিতরের নামায এক রাকাআত; তিন রাকাআত নয়। তাদের বক্তব্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

আব্দুল্লাহ সালেহ
ধানমণ্ডি, ঢাকা

উত্তর : বিতর নামায তিন রাকাআত। এ ব্যাপারে চারও মাযহাবের ইমামগণ একমত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সবসময় তিন রাকাআত বিতর পড়তেন বহু সহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। এমনিভাবে বহু সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের আমলেও বিতর নামায তিন রাকাআত হওয়ার বিষয়টি পাওয়া যায়। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হল-

(১) আবু সালামা রহ. বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম,

عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا.

অর্থ : রমাযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন ছিল? হযরত আয়িশা রাযি. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানে ও রমাযানের বাইরে (তাহাজ্জুদ বিতরসহ) এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাআত পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। এরপর আরও চার রাকাআত পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। এরপর তিন রাকাআত (বিতর) পড়তেন।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ১১৪৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৩৮)

এ হাদীসের বিশ্লেষণে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, তিনি চার রাকাআত পড়ে ঘুমাতেন. তারপর আবার চার রাকাআত পড়ে ঘুমাতেন। অতঃপর উঠে তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।

(আল ইস্তিযকার ২/১০০)

(২) হযরত উবাই ইবনে কা’ব রাযি. বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانيَةِ بقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ... وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ... وَفى رواية ولا يسلم الا فى اخرهن.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। প্রথম রাকাআতে সূরা আ’লা, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরূন, তৃতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়তেন এবং রুকুর পূর্বে দু‘আয়ে কুনূত পড়তেন। একই হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে, আর কেবল শেষ রাকাআতেই সালাম ফিরাতেন।

(সুনানে নাসায়ী হা: ১৬৯৯, মুশকিলুল আসার ১১/৩৬৮) আল্লামা আইনী, ইবনুল কাত্তান, শাইখ শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, স্বয়ং আলবানী সাহেবও ইরওয়াউল গালীলে (২/১৬৭) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাইস রহ. বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম,

بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة.

অর্থ : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাকাআত বিতর পড়তেন? তিনি বলেন, চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন, দশ ও তিন। তিনি বিতর সাত রাকাআতের কম এবং তেরো রাকাআতের অধিক পড়তেন না।

(সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৩৬২, শরহু মাআনিল আসার ১/২০১, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৫১৫৯) আল্লামা আইনী ও শুআইব আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ বলেন, এ ধরনের হাদীসগুলোতে বিতরসহ রাতের পুরো নামাযকেই বিতর শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

(সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৪৫৭) পরবর্তী বক্তব্য দ্রষ্টব্য।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. উপরোল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, আমার জানা মতে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধিক সহীহ হাদীস। এ বিষয়ে হযরত আয়িশা রাযি. এর বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এর দ্বারা সেগুলোর মাঝে সমন্বয় করা যায়।

(ফতহুল বারী ৩/২৫)

আর এই হাদীসে সর্বাবস্থায় তিন রাকাআত পৃথকভাবে পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে, সুতরাং স্পষ্টতই বুঝা যায় এটিই প্রকৃত বিতর।

(৪) সাঈদ ইবনে যুবাইর রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। প্রথম রাকাআতে সূরা আ’লা, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরূন, তৃতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়তেন।

(সুনানে নাসায়ী; হা.নং ১৭০৭, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৪৬২, সুনানে দারিমী; হা.নং ১৫৮৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৬৯৫১, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৭৭৬) শুআইব আরনাউত বলেন, হাদীসটি সহীহ। ইমাম নববী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

(৫) হযরত শাবী রহ. বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কত রাকাআত ছিল?

سألتُ عبدَ الله بنَ عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل فقالا ثلاث عشرة ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر.

অর্থ : তারা উভয়ে বলেন, (তিনি রাতে) মোট তের রাকাআত (নামায পড়তেন) প্রথমে আট রাকাআত অতঃপর তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। আর ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে দুই রাকাআত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করতেন।

(সুনানে নাসায়ী কুবরা; হা.নং ৪০৮, ১৩৫৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৩৬১, শরহু মাআনিল আসার ১/১৯৭)

আল্লামা আইনী বলেন, এর সনদ সহীহ। (নুখাবুল আফকার ৩/২১১)

(৬) আলী ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب [آلعمران:١٩٠] فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثمان صرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث.

অর্থ : অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বা কিয়াম ও রুকূ দিয়ে দুই দুই করে তিন বারে ছয় রাকাআত নামায আদায় করলেন। প্রতিবারই মিসওয়াক ও উযূ করেছেন এবং উপরোক্ত আয়াতগুলো পড়েছেন। সবশেষে তিন রাকাআত বিতর পড়েছেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৬৩, সহীহ আবূ আওয়ানা ২/৩২১)

এছাড়া অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ তিন সূরা দিয়ে তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. তার সুনানে তিরমিযীতে সুস্পষ্ট করে বলেন,

والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة

অর্থ : সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী জ্ঞানীদের অধিকাংশই (বিতরে) সূরা আ'লা, কাফিরূন, ইখলাস পড়াকেই গ্রহণ করেছেন। (তিন রাকাআতের) প্রতি রাকাআতে একটি করে সূরা পড়বে। (সুনানে তিরমিযী [বিতরে কিরাআত পাঠ অধ্যায়])

অনুরূপ ১৯ জন সাহাবী থেকে তিন রাকাআত বিতরে তিন সূরা পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (কাশফুস সিতর; পৃষ্ঠা ৪৭, আল হিদায়া ফি তাখরীজি আহাদীসিল বিদায়া ৪/১৪৮)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فانه قد قبت أن ابى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى رمضان .. ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك سنة لانه اقامه بين المهاجرين والانصارولم ينكره منكر

অর্থ : বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. তার ইমামতিতে লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ অতঃপর তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। (আল ফাতওয়াল কুবরা ২/২৪৫)

হযরত উমর রাযি. বলেন,

مااحب أنى تركت الوتر بثلاث أن لى حمر النعم

অর্থ : আমি তিন রাকাআত বিতর পড়া ছাড়তে কখনোই পছন্দ করি না, যদিও এর বিপরীতে আমাকে লাল উট উপহার দেয়া হয়। (কিতাবুল আসার জামিউল মাসানীদ ১/৪১৭, মুয়াত্তা মুহাম্মদ; পৃষ্ঠা ১৪৯, কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনাহ ১/১৩৫)

এ ছাড়াও হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, আনাস, উবাই ইবনে কা'ব রাযি. প্রমুখ সাহাবী থেকে তিন রাকাআত বিতর পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইসমাইল ইবনে আব্দুল মালেক রহ. বলেন,

عن سعيد بن جبير أنه كان يوتر بثلاث ويقنت فى الوتر قبل الركوع

অর্থ : হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. তিন রাকাআত বিতর পড়তেন এবং বিতর নামাযে রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবাহ; হা.নং ৬৯০৫)

এছাড়াও হযরত আলকামা, ইবরাহীম নাখায়ী, জাবের ইবনে যায়েদ হাসান, কাতাদাহ প্রমুখ তাবেয়ী থেকেও তিন রাকাআত বিতর পড়ার কথা বর্ণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন,

أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم الافى اخرهن

অর্থ : বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাআত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৬৯০৪)

আর যেসব বর্ণনায় এক রাকাআত বিতরের কথা উল্লেখ আছে এগুলোর ব্যাপারে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, 'এক রাকাআত পড়ে নাও' বাক্যে দুই সালামে তিন রাকাআত বিতর পড়ার পক্ষে স্পষ্ট দলীল হয়। (অর্থাৎ এতে এক রাকাআত বিতর-এর পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল নেই বরং বেশির চেয়ে বেশি এখানে দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে আরেক রাকাআত যোগ করে মোট তিন রাকাআত বিতর পড়ার কথা বলা হয়েছে।) হতে পারে এ জাতীয় হাদীসের উদ্দেশ্য হল, পূর্বের পড়া দুই রাকাআতের সাথে আরেক রাকাআত মিলিয়ে মোট তিন রাকাআত বিতর পড়।

দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী একজন বিখ্যাত হাফেযে হাদীস এবং হাদীস শাস্ত্রবিদ। তার ইমামের মাযহাব মতে বিতর নামায দুই সালামে তিন রাকাআত। তিনি এ জাতীয় হাদীস দ্বারা নিজ মাযহাবের পক্ষে দলীল দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বিতর মূলত তিন রাকাআত; এক রাকাআত নয়। সম্ভবত এ কারণেই এক রাকাআত বিতর নামাযের ইঙ্গিত বহনকারী এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করার পরও ইমাম আবূ হানীফা রহ.সহ হাদীস ও ফিকহের অনেক ইমাম যেমন, মুয়াত্তা সংকলক ইমাম মালেক রহ., মুসনাদ সংকলক ইমাম আহমাদ রহ. প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কেরাম এক রাকাআত বিতর পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। (কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনা ১/১৯৩, আল ইশরাফ ২/২৬২, আল আউসাত ৮/১৬০, মাসাইলে আহমাদ ইবনে হানী ১/৯৯, ফাতহুল বারী ইবনে রজব হাম্বলী ৬/১৯৯)

এমনকি ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, বিতর ছুটে গেলে তিন রাকাআতই কাযা করবে। (ফতহুল বারী ইবনে রজব ৬/২২৭)

ইবনে আব্বাস রাযি. এবং ইবনে উমর রাযি. এর যে মারফূ রিওয়ায়েতে এক রাকাআত পড়তে হুকুম করা হয়েছে, মূলত সেগুলোতে এক রাকাআতকে আলাদাভাবে পড়তে বলা হয়নি। একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত উসমান রাযি. এর এক রাকাআত বিতর পড়ার বিষয়টি ছিল অনিচ্ছাকৃত। এজন্যই ঘটনা বর্ণনাকারী আত্তাইনী রাযি. তাকে এক রাকাআত বিতর পড়তে দেখে অবাক হয়েছেন এবং পরক্ষণেই বলেছেন, اوهم الشيخ (তিনি হয়তো ভুলে গেছেন)। (শরহু মাআনিল আসার; পৃষ্ঠা ২০৬)

শাফেয়ী মাযহাবের হাফেযে হাদীস ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, শুধু এক রাকাআত বিতর পড়া যদি এক রাকাআতের হাদীসের উদ্দেশ্য হত তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন। অথচ শুধু এক রাকাআত বিতর পড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

(২৮নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-৩

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত হুদ আলাইহিস সালাম

হযরত নূহ আ.এর দাওয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি যারা ঈমান এনেছিল নূহ আ. এর পুত্র 'সাম' তাদের অন্যতম। সামের সন্তান ছিল ইরাম। ইরামের বংশধরদের মাঝে হযরত নূহ আ.এর পঞ্চম অধস্তন হিসেবে আদ এবং সামূদ নামে দুই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে। এ দুই ব্যক্তির নামানুসারেই 'আদ সম্প্রদায়' এবং 'সামূদ সম্প্রদায়' নামে দু'টি জাতির বিস্তার ঘটে। আদ সম্প্রদায়কে (তাদের পূর্বপুরুষ ইরামের দিকে সম্পৃক্ত করে) পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা ফাজর-এর ৭নং আয়াতে ইরাম সম্প্রদায় বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। (তাসফীরে ইবনে কাসীর [সূরা আ'রাফ- ৬৫], তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [সূরা আ'রাফ- ৬৫])

আম্মান থেকে নিয়ে হাযারামাউত পর্যন্ত ইয়ামানের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তেরোটি গোত্রের সমন্বয়ে বসবাস ছিল আদ সম্প্রদায়ের। (তাসফীরে ইবনে কাসীর [সূরা আ'রাফ- ৬৫], তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [সূরা আ'রাফ- ৬৫])

এগলোর সর্বোত্তম গোত্রের বংশধরদের মধ্য হতে আল্লাহ তা'আলা হযরত হুদ আ.কে নবী হিসেবে তাদের নিকট প্রেরণ করেন।

দৈহিক শক্তিতে এবং পাথর ছেদন শিল্পে আদ সম্প্রদায়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। কালক্রমে তারা পাথর কেটে মূর্তি বানিয়ে তার পূজা শুরু করে দেয়। হযরত হুদ আ. তাদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান করেন। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে, 'হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (সূরা আ'রাফ- ৬৫)

কিন্তু সৎস্বভাবের সামান্য সংখ্যক লোক ছাড়া বাকী সকলে তার কথা প্রত্যাখ্যান করল।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, 'যখন তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করল, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা আ'রাফ- ৭০])

হুদ আ. তাদেরকে (সতর্ক করার উদ্দেশ্যে) বললেন,

'হে আমার কওম! নিজেদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের প্রতি আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে বাড়তি আরো শক্তি যোগাবেন। সুতরাং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। (সূরা হুদ- ৫২)

কিন্তু তার সম্প্রদায় এ কথার প্রতি কর্ণপাত করল না। বরং কুফর ও শিরকের মাঝেই ডুবে থাকল। পরিশেষে আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনার পরিণতিতে তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি আপতিত হল। প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা পাঠানো হল। এ আযাব একাধারে আট দিন সাত রাত তাদের উপর অব্যাহত থাকল। ফলে গোটা কওম ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের সূরা আ'রাফ (৬৫-৭২), সূরা হুদ (৫০-৬০), সূরা মুমিনূন (৩১-৪১), সূরা শু'আরা (১২৩-১৪০), সূরা হা-মীম সাজদা (৪১-৪২), সূরা আহকাফ (২১-২৫), সূরা যারিয়াত (৪১-৪২), সূরা নাজম (৫০-৫৫), সূরা ক্বমার (১৮-২২), সূরা হা-ক্কাহ (৬-৮) এবং সূরা ফাজর (৬-১৪)-এ মুমিনদের উপদেশ দেয়ার নিমিত্তে হযরত হুদ আ. এবং তার কওম আদ সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন– তাফসীরে ইবনে কাসীর (সূরা আ'রাফ- ৬৫), আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (১/১৫৬) এবং আল-কামেল ফিত-তারীখ (১/৬৪)

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম

ইতোপূর্বে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদ ও সামূদ একই ব্যক্তির বংশধরদের দুই ব্যক্তির নাম এবং তাদের দু'জনের নামানুসারেই গোত্র দু'টির নামকরণ করা হয়েছে।

আদ সম্প্রদায়ের মত সামূদ সম্প্রদায়ও অনেক শক্তিশালী জাতি ছিল। কুরআনে কারীমের বর্ণনা মতে (সূরা আ'রাফ- ৭৪) তারা সমতল ভূমিতে ও বিশালকায় পাহাড় কেটে কেটে ঘর নির্মাণে বিশেষ পারদর্শী ছিল। আরব ও শামের মধ্যবর্তী হিজর নামক স্থানে তাদের বসবাস ছিল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা হুদ- ৭৩], আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ১/১৬৮) বর্তমানে উক্ত অঞ্চলটি 'মাদায়েনে সালেহ' নামে পরিচিত। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [সূরা হুদ- ৭৩])

সামূদ সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ কালের স্বাক্ষী হয়ে আজো মানুষের উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে আছে। আদ সম্প্রদায়ের মত তাদের মাঝেও কালক্রমে মূর্তিপূজা শুরু হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য হযরত সালেহ আ.কে তাদের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। হযরত সালেহ আ. সর্বাত্মকভাবে তাবলীগের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। তারা সালেহ আ.এর কথার উপর ঈমান আনার জন্য নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ পাথরের পাহাড় থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করার শর্তারোপ করল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা হুদ- ৭৩]) সালেহ আ. নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করলেন। ফলে আল্লাহর কুদরতে সালেহ আ.এর মু'জিযাস্বরূপ সামূদ গোত্রের চাহিদা মোতাবেক নিকটস্থ পাথুরে পাহাড় ফেটে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল। এটা দেখে সামূদ সম্প্রদায়ের জুনদা' নামক জনৈক সরদার এবং তার সাথে জতিপয় লোক ঈমান কবুল

করল। বাকিরা ঈমান আনতে অগ্রসর হলেও যুআব নামক জনৈক সরদার ও তার সমমনারা এতে বাধা প্রধান করল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা আ'রাফ- ৭৩]) কওমের ওয়াদা ভঙ্গের কারণে সালেহ আ. আযাবের আশঙ্কা করলেন। তাই তাদেরকে উষ্ট্রীর কোন ক্ষতি না করতে নির্দেশ দিলেন।

উষ্ট্রীটি তাদের মাঝেই থাকতে লাগল। তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পূর্ণ এক কূপ পানির প্রয়োজন হত। হযরত সালেহ আ. আল্লাহর নির্দেশে এ নিয়ম নির্ধারণ করলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে আর একদিন লোকেরা পান করবে। যেদিন লোকেরা কূপের পানি পেত না সেদিন আল্লাহর কুদরতে উষ্ট্রীর দুধ এত অধিক পরিমাণে হত যে, পুরো সম্প্রদায় তা দোহন করে পান করত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪৮৪) কিন্তু তা সত্ত্বেও হঠকারিতা বশত কওমের লোকেরা উষ্ট্রী হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। পরিশেষে কুদার নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সেটিকে হত্যা করে ফেলা হল। সালেহ আ. অত্যাসন্ন আযাব সম্পর্কে কওমকে সতর্ক করে বললেন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস গ্রহণের জন্য তোমাদের তিনদিন সময় বাকি আছে। অতঃপর আল্লাহর নির্ধারিত আযাব অবশ্যম্ভাবী।

কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সালেহ আ. কওমকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অত্যাসন্ন আযাবের নমুনা হিসেবে এ তিনদিন তোমাদের চেহারা যথাক্রমে হলুদ, লাল এবং কালো রঙে বিকৃত হয়ে যাবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা হুদ- ৭৮])

চেহারা বিকৃতির ঘটনা তেমনই ঘটল, যেমনটি সালেহ আ. বলেছিলেন। তথাপি হতভাগা সামূদ সম্প্রদায়ের তওবা নসীব হল না। বরং তারা সালেহ আ.কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ষড়যন্ত্রে লিপ্তদেরকে পথেই ধ্বংস করে দিলেন। পরিশেষে আল্লাহর আযাব আপতিত হয় এবং যমীন হতে প্রচণ্ড ভূমিকম্প আর আসমান হতে বিকট এক শব্দে সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীমের সূরা আ'রাফ (৬১-৬৮), সূরা হুদ (৬১-৬৮), সূরা হিজর (৮০-৮৪), সূরা বনী ইসরাঈল (৫৯), সূরা শু'আরা (১৪১-১৫৯), সূরা নামল (৪৫-৫৩), সূরা হা-মীম সাজদা (১৭-১৮), সূরা ক্বমার (২৩-৩২), সূরা শামস (১১-১৫) ও সূরা ইবরাহীম (৮-৯)-এ মুমিনদের উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তে সামূদ সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে তাফসীরে ইবনে কাসীর (সূরা আ'রাফ- ৭২-৭৮), আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (১/১৬৮) ও তারীখে তবারী (১/১৩৮) অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

শিশু-কিশোর মননে সুন্নাতের শিক্ষা বদ্ধমূল করে দিতে শিশুশ্রেণী সমূহে নেসাবভুক্ত করার উপযোগী, অনুশীলনীসহ এই প্রথম তৈরী করা হয়েছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ-
নেসাবে তা'লীমুস সুন্নাহ্

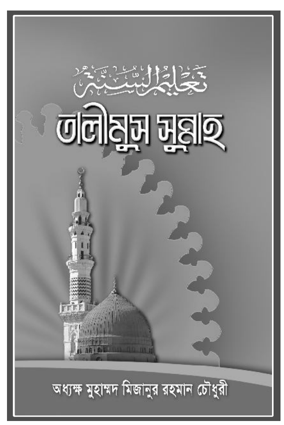

একজন মুমিনের সুন্নাত তরীকায় পবিত্র জীবন যাপনে সহায়ক, ইসলামী জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনা ও শরীয়তের সামগ্রিক হুকুম আহকাম সম্বলিত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি গ্রন্থ-
তা'লীমুস সুন্নাহ্

কিতাব দুটি সংকলন করেছেন

মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক রহ. এর সুযোগ্য
খলীফা ও মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনার মুহতারাম নায়েম
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী
পীর সাহেব দেওনা

মুহিউস্‌সুন্নাহ্ প্রকাশনী
মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১১

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে, প্রাণীকুলের রিযিক তার নিজ দায়িত্বে। রিযিক লাভ করা তালাশের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং আল্লাহর দানের উপর নির্ভরশীল। তবুও সীমিত সংখ্যক মাখলুককে তিনি রিযিক তালাশের দায়িত্ব দিয়েছেন প্রথা হিসেবে। শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানুষের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। গড়ে আট-দশ জনের মধ্যে মাত্র এক-দু'জনের দায়িত্ব রিযিক তালাশ করা, বাকিরা সব পেনশভোগী। অবশ্য শান্তিপূর্ণভাবে রিযিক পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে- (ক) আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা। (খ) আল্লাহকে ভয় করা।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

অর্থ : যে আল্লাহর প্রতি ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

আরো ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

অর্থ : যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য তিনি পথ খুলে দেন এবং ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করেন। (সূরা ত্বালাক- ২, ৩) কেউ এ শর্ত দু'টি লঙ্ঘন করলেও দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাকে রিযিক দিবেন। কিন্তু তাতে শান্তির নিশ্চয়তা নেই। বরং অশান্তি অনেকটা নিশ্চিত। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আরোপিত শর্তের খেলাফ করার কারণে পর্যাপ্ত রিযিক পেয়েও শান্তি পায়নি খোদার অনেক বান্দা। এদের মধ্য থেকে নমুনাস্বরূপ একজনের কাহিনী আজকের আলোচ্য বিষয়।

সম্পর্কে তিনি আমার দুঃসম্পর্কীয় একফুফুর একমাত্র পুত্র সন্তান। কয়েক বোনের মধ্যে তিনিই একমাত্র ভাই। বাবা মৃত্যুবরণ করেছেন। পিতার একমাত্র ছেলে হিসেবে তিনিই এখন গোটা বাড়ির অভিভাবক। আমাদের দেশের প্রচলিত নাজায়েয প্রথা হিসেবে পৈতৃক সম্পত্তি অবণ্টিত। সকল সম্পত্তির ভোগ-দখলকার তিনি একাই। বোনেরা আসে-যায়, দু-চারদিন বেড়ায়। মূর্খ সামাজিকতার কারণে তারা মনে করে পৈতৃক সম্পদে তাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নেয়ার এখনো সময়ই আসেনি। জমি-জমার পরিমাণও কম নয়। বর্গা চাষ করায়। ফসল যা আসে তাতে খাদ্যের প্রয়োজন মিটেও কিছু অবশিষ্ট থাকে। বাড়িতে ফল-ফলাদি, তরি-তরকারি, মাছ-মুরগি যা হয়, তাতে সংসার ভালোই চলে যায়। তবে নগদ অর্থকড়ি সবসময় পর্যাপ্ত থাকে না। মৌসুমী ফসলাদি বিক্রি করলে কিছুদিন ভালোই কাটে। অন্যথায় বছরের বেশির ভাগ সময় নগদ টাকার সঙ্কট থাকে। খানা-পিনার চিন্তা না থাকলেও নগদ অর্থসঙ্কট তাকে দুঃচিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। সে ভাবে, বোনেরা নিজ নিজ অংশ নিয়ে গেলে পরবর্তীতে চলবো কী করে? বৃদ্ধা মা, পাঁচ সন্তান আর স্বামী-স্ত্রী মিলে আটজনের সংসার। জমির আয়ে কি ভবিষ্যত চলবে? দীর্ঘ ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিল সৌদি আরব যাবে। কিছু জমি বন্ধক দিয়ে আর কিছু টাকা কর্জ নিয়ে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ যোগাড় করল। ভিসাপ্রাপ্তি মোটামুটি চূড়ান্ত হওয়ার পর মামা-মামী ও মামাতো ভাই-বোনদেরকে এ বিষয়ে জানাতে এবং সকলের কাছ থেকে দু'আ নিতে আসল। ঘটনাক্রমে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু কেউ তার এ উদ্যোগকে সমর্থন করেনি। সবার কথা হল, তুমি তো দেশেই ভালো আছো, এখানে তোমার অভাব কোথায়? সন্তানেরা তাদের ভাগ্য নিয়ে বড় হবে। তোমার বৃদ্ধা মা, স্ত্রী-সন্তানদেরকে ফেলে বিদেশে গিয়ে থাকতে পারবে না। দেশে তো এ যাবত তেমন কোনো পরিশ্রম করনি। বিদেশে তো আর কেউ তোমাকে বিনা পরিশ্রমে টাকা দিবে না। তাছাড়া বিদেশের পরিশ্রম তো তোমার সহ্য হবে না ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুনেছি, তার মা-ও তাকে বারবার নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী ও বোনদের এতে সমর্থন ছিল। ফলে সে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় রইল। অবশেষে 'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়' প্রবাদটিই তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল। প্রায় সকলের অমতে সে সৌদি আরব পাড়ি জমাল। অথচ কঠিন পরিস্থিতি না হলে বাবা-মায়ের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রবাসে চলে যাওয়া শরীয়তমতে জায়েয নেই। সন্তানকে তখন বাবা-মায়ের কাছে অবস্থান করেই রিযিক তালাশ করতে হয়।

সৌদি আরব গিয়ে সে এক খেজুর বাগানে পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত হয়। বেতন খুব বেশি নয়। ওভার টাইমেরও সুযোগ নেই। প্রায় দেড় বছর চাকুরী করে বেতন যা পেয়েছে তাতে বন্ধকী যমীনও ছুটেনি, ঋণও পরিশোধ হয়নি। উষ্ণ আবহাওয়ায়

কষ্টকর পরিশ্রমী জীবন, বৃদ্ধা মা আর স্ত্রী-সন্তানদের বিরহ একদিনের জন্যও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এরই মধ্যে একদিন ডিউটির পর রুমে এসে বালিশের পাশে সে একটি চিঠি দেখতে পায়। বেনামী চিঠি, বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়েছে। পত্রলেখক তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে লিখেছে– 'তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। আর বড় মেয়েটি একটি ছেলের সঙ্গে উধাও হয়ে গেছে।'

প্রবাসের একাকী জীবনে স্বামীরা এমনিতেই স্ত্রীদের নিয়ে টেনশনে থাকে। কারণ বেপর্দা সমাজে স্বামীর পাঠানো টাকায় হাট-বাজারে ঘুরে বেড়ানো বিবাহিতা নারীর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কতোটা কষ্টকর বিবেকবান স্বামীর এ মর্মে কিছু ধারণা থাকা স্বাভাবিক। অপরদিকে অভিভাবকহীন একজন সেয়ানা মেয়ের পক্ষেও বর্তমানে যে কোন পাপে জড়ানো অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই দু'টো তথ্যই সে সত্য বলে ধরে নিল । এখন তার চিন্তা, স্ত্রীও গেল! মেয়েও গেল! তাহলে এমন জীবনের মূল্য কী? এরপর আর দেশে গিয়ে মুখ দেখাবো কীভাবে? আর দেশেই যদি যেতে না পারলাম তাহলে বিদেশ-বিভূঁইয়ে রৌদ্রে জ্বলে শিককাবাব হওয়ায় কী লাভ? দেশে ফিরে একটু শান্তিতে থাকার আশায় কষ্ট করতে বিদেশে আসলাম; আর এ-ই বুঝি আমার জীবনের শান্তি? এসব ভেবে ভেবে সে অঝোরে কিছুক্ষণ কাঁদল। সে যুগে তো মোবাইল ফোনের ছড়াছড়ি ছিল না যে, তাৎক্ষণিক ফোন করেই সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিবে। চিঠিই ছিল সাধারণ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। সে সময় চিঠি আদান-প্রদানে প্রায় একমাস সময় লেগে যেতো। চরম হতাশা তাকে এতো দীর্ঘ প্রসেসিংয়ে যেতে দেয়নি। একপর্যায়ে ক্ষোভে দুঃখে সে খেই হারিয়ে ফেলল। অতঃপর সর্বগ্রাসী হতাশা তাকে আত্মহননের পথে তাড়া করল। সহকর্মীরা দেখছে, সে কয়েকদিন ধরে অসুস্থ। শরীরের তুলনায় মানসিক ব্যাধিতেই বেশি আক্রান্ত। অধিকাংশ সময়ে নির্বাক। কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না। একদিন তারা দেখে তার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দুপুর হয়ে গেছে, একবারের জন্যও বের হয়নি। তাদের সন্দেহ হল। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পর দরজায় সজোরে আঘাত করল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। তারা নিশ্চিত হয়ে গেল, সে মারা গেছে নয়তো আত্মহত্যা করেছে। অগত্যা দরজা ভেঙ্গে দেখে সে ফ্যানের সাথে ঝুলে আছে! (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সাথীরা তাদের মালিককে খবর দিল। মালিক এসে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে প্রশাসনিক নিয়ম-কানুনের কাজ সেরে লাশ হিমাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। দেশের আত্মীয়-স্বজনেরা প্রথমে খবর পেল, সে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। পরে অবশ্য বাস্তব ঘটনাও জানাজানি হয়ে যায় এবং শতভাগ মিথ্যা খবর দিয়ে লেখা চিঠির বিষয়টিও গোপন থাকেনি। তবে এমন জঘন্য শত্রুতা কার পক্ষে করা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাব আজ পর্যন্ত মেলেনি।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, মরেও তার বিড়ম্বনা শেষ হল না । সৌদি মালিকের পক্ষ থেকে পরিবারকে জানানো হল, লাশ সৌদিতে দাফনের অনুমতি দিলে পরিবারকে সে কিছু আর্থিক অনুদান পাঠিয়ে দিবে। অন্যথায় অনুদানের অর্থে লাশ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। এই প্রস্তাব শুনে মরহুমের মামা ও মামাতো ভাই-বোনসহ সকল হিতাকাঙ্ক্ষী তার স্ত্রীকে সৌদিতেই লাশ দাফনের অনুমতি দেয়ার পরামর্শ দিল, যেন শরীয়তের বিধানও রক্ষা হয় এবং ইয়াতীম সন্তানাদি ও বিধবা স্ত্রী আর্থিকভাবে উপকৃত হয়। কিন্তু নির্বোধ বোন ও ভগ্নিপতিরা এতে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাদের এককথা– আমরা আমাদের ভাইয়ের লাশ বিক্রির টাকা চাই না, ভাইকে এক নজর দেখতে চাই। এ বলে তারা তার ভাবীকে বাধ্য করল লাশ দেশে পাঠানোর আবেদন করতে। এ আবেদন সৌদিতে পৌঁছতে এবং লাশ দেশে আসতে প্রায় তিন মাস সময় লেগে গেল। দীর্ঘ সময় হিমাগারে পড়ে থাকা লাশ আগুনে পোড়া গাছের মত কালো হয়ে গেছে। যে দেখে সে-ই ভয় পেয়ে যায়। এদিকে করুণ মৃত্যুর সংবাদে তিন মাসব্যাপী শোকের আগুনে মায়ের অন্তরও পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। স্ত্রী-সন্তানদেরও একই অবস্থা। ইসলামী বিধান অনুযায়ী মৃত্যুর পরপরই লাশ দাফন হয়ে গেলে এতদিনে যে অন্তগুলোর ক্ষত প্রায় শুকিয়ে যেতো, শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করায় দীর্ঘ শোকের আগুনে ভস্ম অন্তরগুলো লাশের মুখ দেখার পর দাউ দাউ জ্বলে উঠল নতুন করে। পাড়া-প্রতিবেশীরা ধিক্কার দিতে লাগল, 'কী দরকার ছিল লাশ দেশে আনার? এতে কার কী লাভ হল?' অবশেষে সকলেই প্রত্যক্ষ করল, শরীয়ত ও সুস্থ বিবেকহীন নাদান আত্মীয়-স্বজন মানুষের দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের জন্য কতটা ক্ষতিকর।

এদিকে জনম-দুখিনী মা কলিজার টুকরা পুত্রের করুণ ও বীভৎস চেহারা দেখার পর থেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন, পাগলের মত এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতেন আর আবোল-তাবোল বকতে থাকতেন। এভাবে ছয় মাসের মাথায় হতভাগা পুত্রের পাশে মা-ও চির নিদ্রায় শায়িত হলেন। মা ছিলেন আগের দিনের সাদাসিধে নেককার মহিলা। সেই দুখিনী মায়ের আহাজারি, আর নিষ্পাপ ইয়াতীমদের আর্তনাদে যদি হতভাগার শেষ পাপসহ জীবনের সকল পাপ ধুয়ে মুছে যায়– অসীম ক্ষমা ও ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহর দরবারে এ-ই আমাদের একান্ত দু'আ।

লেখক : আবু তামীম

(২৩নং পৃষ্ঠার পর; বিতর নামাযের...)

এক বারের জন্যও প্রমাণিত নয়। (আত তালখীসুল হাবীর ২/৩১)

শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম ইবনুস সালাহ তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এক রাকাআত বিতর পড়েছেন এর কোন প্রমাণ নেই। (কাশফুস সিতর; পৃষ্ঠা ৩৮)

ইমাম মালেক রহ. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও উসমান রাযি. এর এক রাকাআত বিতর প্রসঙ্গে বলেন,

وليس العمل عندنا على ان يوتر بواحدة ليس قبلها شيء

অর্থ : আমাদের মদীনায় দুই রাকাআত যুক্ত করা ছাড়া শুধু এক রাকাআতে বিতর পড়ার উপর কোন আমল নেই। (কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ ১/১৯৩)

وليس على هذا العمل عندنا ولكن ادنى الوتر ثلاث

অর্থ : আমাদের মদীনায় এর উপর আমল নেই বরং সর্বনিম্ন বিতর তিন রাকাআত। (মুয়াত্তা মালেক; হা.নং ৪০৭)

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. শুধু এক রাকাআত বিতর পড়াকে মাকরূহ বলেছেন। (আল-আওসাত ইবনুল মুনযির ৫/১৮৪, মাসাইলে আহমাদ ইবনে হানী ১/৯৯)

ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আলাদাভাবে শুধু এক রাকাআত বিতর পড়া সম্পর্কে কিছুই বর্ণিত হয়নি। (শরহু মাআনিল আসার; হা.নং ১৬০৯)

অ ল্প ক থা গ ল্প ন য়

মক্কা-মদীনার টুকরো স্মৃতি

আজব সওদাগর

তাঁবু পড়েছিল মিনার সীমানা পেরিয়ে বিদায়া মুযদালিফায়। আরবীতে 'বা' হরফযোগে যে বিদায়া তার অর্থ সমাপ্তি নয়, শুরু। ১২ই যিলহজ্জ তাঁবুতে যোহর পড়ে জামারার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। সাত সংখ্যার ছোট্ট কাফেলা। যিম্মাদার রাবেতার আমীরে মজলিসে শূরা। তাঁকে অনুসরণ করে এবারের মতো তিন শয়তানকে আখেরী রকম নাজেহাল করা হল। জামারা পেরিয়ে মিনিট দশেক হাঁটলেই হাতের বাঁয়ে মক্কা অভিমুখী পায়ে হাঁটা পথ। বিশাল প্রশস্ত টিনশেড। এ পথেই টিনশেডের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের নিচ দিয়ে বিখ্যাত 'নাফাক্ব' বা সুড়ঙ্গপথ। দৈর্ঘে পুরো দেড় কিলোমিটার। আগে কোন কোন বছর বিদ্যুৎসরবরাহ বন্ধ হয়ে এ সুড়ঙ্গে শহীদ হয়েছে বহু হাজী সাহেবান। এখন সম্ভবত অতোটা আশঙ্কাজনক নয়। টিনশেডের ছায়ায় ঢিমেতালে হাঁটছিলাম। হালকা পাতলা ভিড়। দশ তারিখের চাপাচাপি নেই। পায়ের নিচে বেশুমার খালি বোতলের গড়াগড়ি। এক হাজী সাহেবকে দেখলাম, শৈশব ফিরে পেয়েছেন। সংযত পদাঘাতে একটা বোতল গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাল সামলাতে বোতলের সঙ্গে নিজেও হচ্ছেন ডান-বাম। শৈশবই বটে, দুদিন আগেই না মাওলায়ে কারীম তাকে নবজাতকের মত নিষ্পাপ করে দিয়েছেন! মনে হল, ক্লান্ত শরীরকে অন্যমনস্ক রাখার এ এক দারুন অজুহাত।

প্রচণ্ড গরমে টানা দু' ঘণ্টার হাঁটায় আমাদেরও হাঁপ ধরে গিয়েছিল। পথের দু'পাশে পর্যাপ্ত শীতল পানির ব্যবস্থা। কিছুক্ষণ পরপর দু' চার মিনিট জিরিয়ে নেই। পানি সংগ্রহ করে আকণ্ঠ পান করি। মাথা, চেহারা ও পা ভিজিয়ে তাজাদম হই। নতুন অভিজ্ঞতা, শীতল পানির ছোঁয়ায় পায়ে আসে বল, কাজ করে মাথা। আমীর ছাহেব বললেন, পানি আর কতক্ষণ এবার পানীয়ের খোঁজ লাগাও! কিছুদূর এগিয়ে একটা অস্থায়ী দোকানের দেখা মিলল। দু'জনে গিয়ে দরদাম করে সাতটি কোমল পানীয় চাইলাম। দোকানী 'সবর, সবর' বলে এগিয়ে দিল সাতটি নয়, দু'টি বোতল। শুনতে পায়নি ভেবে একটু জোরেই বললাম, 'নুরীদ সাবআ'–সাতটি চাই। দোকানী ইতি-উতি করে বলল, 'এইন্ সাবআ'– অর্থাৎ নিবে তো, কিন্তু সাতজন কোথায়? মুখে বললাম, ঐ-তো বিশ্রাম নিচ্ছে। মনে মনে বলি, ভারী ঝামেলা তো! টাকা দেবো, সদাই নেবো–কার জন্য তা-ও দেখাতে হয় নাকি? দোকানীর ইঙ্গিতে তার সহযোগীটি সাতটা 'ক্যান' প্যাকড করে দিল। বড়রা লিখেছেন, হজ্জের সফরে কারও আচরণ মনমতো না হলে কোন সুন্দর ব্যাখ্যা করে নিবে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপারগ মনে করবে। সে অনুযায়ী ভাবছিলাম, এটাও শিক্ষণীয় যে, ইমারজেন্সীর সময় কেউ টাকা-পয়সা থাকলেই পুরো দোকানটা কিনে নিবে, আর কেউ জরুরী সামানও সংগ্রহ করতে পারবে না–এটা অমানবিক। সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য করেই দোকানী 'এইন্' বলে সাতটি ক্যানের প্রয়োজন যাচাই করে নিয়েছেন। কিন্তু ব্যাখ্যাটি টিকল না, যখন বাড়িয়ে দেয়া নোটটি হুবহু ফিরিয়ে দেয়া হল। জাল টাকা সৌদিতে অসম্ভব, আইনও বেজায় কঠোর; গর্দান-টর্দান কিছু একটা নেমে যাবে হয়তো। মনের খুঁতখুঁতি চেপে রেখেই 'শৈইখ্! বিফায্লিকা খুয্ হাযা' বলে আবারও নোটটি এগিয়ে দিলাম। এবার বিস্ময়ের পালা। নোটটি না ধরেই দোকানী বললেন, 'লা, ওয়াল্লাহে; হাদ্য়া, মাজ্জানান্'। আমার সঙ্গীটি এতদিনে দু'চারটে আরবী বুঝতে পারেন। তিনি খাস বাংলায় শুরু করলেন– 'কিসের হাদিয়া, কিসের মাগ্না, উনারে টাকা নিতে কন; ভালা জায়গায় আইসা খর্চা করনের সুযোগ খুঁজতাছিলাম, আর উনি কন কিনা মাগ্না! না, না টাকা নিতে হইবো।' দোটানায় পড়ে গেলাম। একদিকে সফরসঙ্গীর মুখলিসানা আবদার, অপরদিকে দরাজদিল আরবের মেহমানদারী। সঙ্গীকে বললাম, আপনি গিয়ে এগুলো বণ্টন করুন, এদিকটা আমি দেখছি। দোকানিকে শুধালাম, জনাব! দোকান খুলেছেন, দরদামও করেছেন কিন্তু সদাই দিয়ে দাম নিচ্ছেন না যে! রহস্যটা কী? মুচকি হেসে তিনি যা বললেন তা শুধু গল্পেই শোনা যায়। 'হাজ্জী! দোকান খুলেছি ঠিক। বিক্রিও করেছি যথেষ্ট। আগে থেকেই নিয়ত করেছিলাম, বারো তারিখ যোহর পর্যন্ত কামাবো দুনিয়া, আর যোহরের পর কামাবো আখেরাত। যোহরের পর মাল-সামানা যা-ই অবশিষ্ট থাকুক স-ব হাজ্জীদের সেবায় পেশ করবো। কিন্তু গণবণ্টন হলে কেউ কেউ হয়তো জরুরত ছাড়াও গ্রহণ করবে, সম্ভবত আরাফায় তোমরা তা দেখেও এসেছো। এই আশঙ্কায় একটু বেচাকেনার অভিনয় আর কি!' কী আর করা! টাকার মূল্য যার কাছে তুচ্ছ, ভাবছিলাম এমন ভালো মানুষকে আর কী দিয়ে মূল্যায়ন করা যায়। মনে-মুখে তাকে 'জাযাকাল্লাহ'-এর অমূল্য বিনিময় পেশ করলাম। আবার শুরু হল রাশি রাশি বোতল মাড়িয়ে মক্কা অভিমুখে পদযাত্রা। সঙ্গে অবিস্মরণীয় এক সুখস্মৃতি।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আবূ সাফওয়া

গ্রন্থ পরিচিতি

ফাযায়েলে আ'মাল

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক

লেখক পরিচিতি :

জন্ম ও শিক্ষা : আলোচ্য গ্রন্থ ফাযায়েলে আ'মালের লেখকের নাম শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া রহ.। তিনি ছিলেন একাধারে বিদগ্ধ আলেম, শাইখুল হাদীস, বিজ্ঞ লেখক, মহান সংস্কারক, দা'য়ী ইলাল্লাহ এবং কামেল ওলী। ইলমে হাদীসের সঙ্গে তার ছিল নিবিড় সম্পর্ক, গভীর অনুরাগ। হাদীস শাস্ত্রে তার বুৎপত্তি ও খিদমত এতোটাই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, সারা বিশ্বে তিনি শাইখুল হাদীস হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন। এমনকি তার নামের চেয়ে উপাধিটিই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার নাম বললে কেউ হয়তো না-ও চিনতে পারে; কিন্তু শাইখুল হাদীস বললে ঠিকই চিনে নিবে। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের কান্ধালার অধিবাসী ছিলেন। ১৩১৫ হিজরীর ১১ই রমাযান রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহান বুযুর্গ হযরত ইসমাঈল রহ. এর দৌহিত্র এবং দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান কর্মপদ্ধতির প্রবর্তক হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ.এর ভাতিজা। তার সম্মানিত পিতার নাম হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহ.।

শৈশবের আড়াই বছর তিনি কান্ধালায় কাটিয়েছেন। অতঃপর কান্ধালা হতে গঙ্গুহ গমন করেন। এখানে তিনি তার পিতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহ. এবং কুতবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এর সাহচার্যে ছিলেন। এখান থেকেই তার অন্তরে ইলমী যোগ্যতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার বীজ অঙ্কুরিত হয়, যা পরবর্তীতে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সাত বছর বয়সে তার শিক্ষা শুরু হয়। স্বীয় পিতার তত্ত্বাবধানে দরসে নেযামীর গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহের পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ইলমে হাদীস অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। পিতার কাছেই বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মিশকাত শরীফের পাঠগ্রহণের মাধ্যমে তার ইলমে হাদীস আহরণের সূচনা হয়। অতঃপর তিনি স্বীয় উস্তাদ হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. এর কাছে হাদীস শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ইলম অর্জন করেন। হাদীস শিক্ষা গ্রহণের এ সময়েই তিনি তার উস্তাদের তত্ত্বাবধানে আবূ দাউদ শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বাযলুল মাজহুদ' সংকলনের কাজে অংশগ্রহণ করেন। এ কাজে তার সীমাহীন অনুরাগ ও গভীর অভিনিবেশের স্বীকৃতি স্বয়ং হযরত থানবী রহ.ও দিয়েছেন।

শিক্ষা পরবর্তী জীবন

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের পর ১৩৩৫ হিজরীতে ২০ বছর বয়সে মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই যোগ্যতা ও দক্ষতা বলে সর্বোচ্চ শ্রেণীর বিভিন্ন কিতাব পড়ানো শুরু করেন। এরপর নিজের প্রিয় শাস্ত্র হাদীসের কিতাব 'মিশকাত শরীফ'-এর দরস প্রদান করেন। অতঃপর ১৩৪৪ হিজরীতে তার সম্মানিত উস্তাদ হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. তাকে শাইখুল হাদীস পদে মনোনীত করেন। সেই সাথে তাকে ইহসান তরীকতের চারও সিলসিলার মাধ্যমে বাইয়াতের এজাযত দেন।

রচনা ও সংকলন

হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. রচনা ও লেখালেখির কাজ ছাত্র যামানা থেকেই শুরু করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ তিনি স্বীয় আত্মজীবনী আপবীতী'তে উল্লেখ করেছেন। হযরত মাওলানা শাহেদ সাহেবের মতে তার রচনাবলীর সংখ্যা ১০৩। এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ৪২টি। আর অপ্রকাশিত রয়েছে ৬১টি। তার গ্রন্থসমগ্রের বিষয়ভিত্তিক তালিকা নিম্নরূপ-

- ○ ইলমে তাফসীর সম্পর্কে ২টি।
- ○ ইলমে হাদীস সম্পর্কে ৬০টি।
- ○ ইলমে ফিকহ সম্পর্কে ৪টি।
- ○ ইতিহাস ও জীবনী সম্পর্কে ২২টি।
- ○ ইলমে কিরাআত সম্পর্কে ২টি।
- ○ ইলমে নাহব ও মানতিক সম্পর্কে ৩টি।
- ○ ইলমে সুলূক ও ইহসান সম্পর্কে ৩টি।
- ○ ইসলামের উপর আরোপিত আপত্তির জবাবে ৪টি।
- ○ এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে আরো ৩টি।

ওফাত

দাওয়াত ও ইসলাহের সংস্কারমূলক ঈর্ষণীয় খিদমত আঞ্জামদানকারী এই মহামনীষী সারা জীবন যে নবীজীর কথা, কাজ-কর্ম ও জীবন-চরিত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ করেছেন, সেই পেয়ারা নবীর প্রিয় আবাসভূমি মদীনা মুনাওয়ারায় মহান রব্বে কারীমের ডাকে সাড়া দেন। ১৪০২ হিজরীর ১লা শাবান মোতাবেক ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে মে সোমবার বিকাল ৫টা ৪০মিনিটে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ইশার নামাযের পর মসজিদে নববীর ইমাম শাইখ আব্দুল্লাহ যাহের রহ. জানাযার ইমামতি করেন। এরপর বাবে জিবরীল হয়ে তার লাশ বাকীউল গরকদে নিয়ে যাওয়া হয়। তার ইচ্ছানুযায়ী আহলে বাইতের বরাবর এবং হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. এর কবরের নিকটে কবর খনন করা হয়। আশপাশে অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি বাকীউল গরকাদের বরকতময় মাটিতে হাদীসের এই মহান খাদিম সমাহিত হন। এর মাধ্যমে তার সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়, যার জন্য তিনি দিন-রাত অস্থির সময় কাটাতেন।

কিতাব পরিচিতি:

ফাযায়েল শব্দটি ফযীলত শব্দের বহুবচন, অর্থ: মর্যাদা, গুণ, ফযীলত। আর আ'মাল শব্দটি আ'মল শব্দের বহুবচন, অর্থ: কর্ম, কাজ, আমল। দুটোর সমন্বয়ে 'ফাযায়েলে আ'মাল'। সমন্বিত অর্থ: আমলসমূহের ফযীলত বা মর্যাদাসমূহ।

কিতাবের বর্ণনা ও বিন্যাস

ফাযায়েলে আ'মাল কিতাবটি মূলত হযরত শাইখ যাকারিয়া রহ. এর ৯টি পুস্তিকার সমন্বিত নাম। পুস্তিকাগুলো তিনি তার মুরুব্বীদের নির্দেশে রচনা করেছেন। ফাযায়েলে নামায, ফাযায়েলে যিকর, ফাযায়েলে তাবলীগ, ফাযায়েলে রমাযান ও ফাযায়েলে সাদাকাত এই পাঁচটি পুস্তিকা রচনা করেছেন আপন চাচা, প্রখ্যাত দা'য়ী, বর্তমান তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর নির্দেশে। ফাযায়েলে কুরআন ও ফাযায়েলে দুরূদ পুস্তিকাদ্বয় রচনা করেছেন শাহ সাইয়িদ ইয়াসীন সাহেব নাগিনবী রহ.এর নির্দেশে। ফাযায়েলে হজ্জ রচনা করেছেন হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী রহ.এর আবেদনে। হেকায়াতে সাহাবা রচনা

করেছেন হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.এর নির্দেশে।
পুস্তিকাগুলোর রচনাবিন্যাস খুবই চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী। কিতাবের আলোচনাগুলো তিনি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে পেশ করেছেন। প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনে কারীমের আয়াত উল্লেখপূর্বক উর্দূ ভাষায় তার অনুবাদ পেশ করেছেন। অতঃপর ফায়দা শিরোনামের অধীনে বিষয়সংশ্লিষ্ট কুরআনের অন্যান্য আয়াত, হাদীস এবং বুযুর্গানে দীনের বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা মূল আয়াতের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ-সংশ্লিষ্ট কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছেন। সে বিষয়ে সহীহ হাদীস না থাকলে বা আলোচনাকে দীর্ঘ করার প্রয়োজন বোধ করলে যয়ীফ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। তবে যয়ীফ হাদীসের সমর্থনে আরো কিছু হাদীস পেশ করেছেন যেন তা সহীহর স্তরে উন্নীত হয় বা উক্ত যয়ীফ হাদীসেরও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি আছে তা সহজে প্রতীয়মান হয়। সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং অনেক স্থানে হাদীসটির ব্যাপারে ইমামদের মন্তব্যও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর উল্লিখিত হাদীসের অনুবাদ করেছেন। তবে উদ্ধৃতি ও ইমামদের উক্তি অনুবাদের প্রয়োজন মনে করেননি। অতঃপর ফায়দা শিরোনামে উল্লিখিত হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এতে তিনি যেমন প্রচুর হাদীসে নববী উল্লেখ করেছেন তেমনি সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি পেশ করেছেন। কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বসূরীদের বিভিন্ন ঘটনা এবং কারামতও উল্লেখ করেছেন। তবে এসব ঘটনা ও কারামত কিতাবের কলেবরের তুলনায় নিতান্তই সামান্য।

বৈশিষ্ট্যাবলী

ফাযায়েলে আ'মাল সমগ্র পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ, গ্রহণযোগ্য ও সর্বসমাদৃত একটি গ্রন্থ। এটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। পূর্ব হতে পশ্চিম, উত্তর হতে দক্ষিণ সারা পৃথিবী জুড়ে এর পাঠকপ্রিয়তা বিস্ময়কর। মুসলমানদের অধঃপতনের এই ক্রান্তিকালে ফাযায়েলে আ'মাল বিলিয়ে চলেছে হেরার আলোকরশ্মি। ফাযায়েলে আ'মাল ইলম ও মা'রিফাতের চিন্তা ও অনুপ্রেরণার অশেষ খাযানা । মানুষের অন্তরে শরীয়ত ও আহকামে শরীয়তের বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা সৃষ্টিতে অতুলনীয়। ইসলামী দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালনকারী প্রতিটি আলেম, তালিবে ইলম এবং সাধারণ মানুষের জন্য দিকনির্দেশক। এর উজ্জ্বল আলোয় গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছতে সক্ষম উম্মতের দাওয়াতী কাফেলা। বিশেষত একজন আলেমে দীন এই কিতাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে কুরআন-হাদীস, আ-সা-র ও উলামায়ে কেরামের মূল্যবান বাণীসমূহের এক অমূল্য ভাণ্ডার লাভ করেন। সাথে সাথে কুরআন-হাদীসের বহু অস্পষ্ট বিষয় আত্মস্থ করার পর্যাপ্ত সহযোগিতা পান। এর প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ ইখলাস, লিল্লাহিয়াত ও নূরানিয়্যাত দ্বারা পরিপূর্ণ। একবার পাঠ করলেও অন্তর আলোকিত ও নূরান্বিত না হয়ে পারে না। আর এটা প্রমাণিত সত্য যে, কিতাবটি লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কিতাবটি সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত দা'য়ী ইলাল্লাহ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী রহ. বলেন, 'ফাযায়েলে আ'মাল গ্রন্থ দ্বারা ধর্ম এবং মানবতার এতখানি উপকার সাধিত হয়েছে যে, কোন আলেম যদি বলে ফেলে, এই কিতাবের উছিলায় আল্লাহর হাজারো বান্দা ওলি-আউলিয়ায় পরিণত হয়েছে তাহলে অত্যুক্তি হবে না।' (যিকরে যাকারিয়া; পৃষ্ঠা ৩১৬)

শাইখ নদবী রহ. আরো বলেন, 'বর্তমানে পুরো দুনিয়ায় কুরআনের পর যে কিতাবটি সবচেয়ে বেশি প্রচার লাভ করেছে ও বারংবার পঠিত হচ্ছে তা হল ফাযায়েলে আ'মাল।' (তাহকীকুল মাকাল; পৃষ্ঠা ৪)

শাইখ ইউসুফ বানূরী রহ. বলেন, 'শাইখ যাকারিয়া রহ. উর্দূ ভাষায় কিছু পুস্তক যেমন, শামায়েলে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, হেকায়াতে সাহাবা, ফাযায়েলে সাদাকাত, ফাযায়েলে হজ্জ, ফাযায়েলে দুরূদ ইত্যাদি লিখেছেন সর্বস্তরের মানুষের হিদায়াত ও রাহনুমায়ীর জন্য। সকলেই কিতাবগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা কিতাবগুলোর মাধ্যমে মানুষকে সীমাহীন উপকৃত করছেন। বিপথে যাওয়া মানবজাতিকে সংশোধন করছেন। কিতাবগুলো দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদের জন্য পথপ্রদর্শক। তারা নিজেদের মধ্যে নিয়ম করে নিয়েছেন যে, এগুলো নিয়মিত পড়া হবে এবং সাধ্যমতো মুখস্থ করতে হবে। (তাহকীকুল মাকাল; পৃষ্ঠা ৪)

প্রিয় পাঠক! কিতাবটির প্রশংসায় যা বলা হল, কিতাবটির উপকারিতার তুলনায় তা কমই বটে। কিতাবটি নিজেই তার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। যার ফলে বিশ্বের প্রায় সকল ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে। যারা কিতাবটির উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন, কিতাবটি সম্পর্কে অজ্ঞ বলেই তা করে থাকেন। সত্যনিষ্ঠ ও বিবেকবান কোন ব্যক্তি কিতাবটির উপকারিতা ও অবদান অস্বীকার করার কল্পনাও করতে পারে না।

ফাযায়েলে আ'মালের ব্যাপারে বিভ্রান্তি :

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ফাযায়েলে আ'মালের ওপর চিহ্নিত একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু অমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করে সরলমনা দীনদার মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এটা মুসলমানদেরকে আমলবিমুখ করার ষড়যন্ত্র বৈ কিছুই নয়। তাদের প্রতিটি আপত্তির সবিস্তার সমাধান দিতে হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। তবে মৌলিকভাবে যে দু'টি প্রশ্ন বা আপত্তি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে শুধু সে দু'টির বাস্তবতা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

১ নং আপত্তি : শাইখ যাকারিয়া রহ. এ কিতাবে অত্যধিক পরিমাণে যয়ীফ ও মউযূ' (জাল) হাদীস উল্লেখ করেছেন। অথচ যয়ীফ ও জাল হাদীসের কারণে দীনের রূপরেখা পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং এই কিতাব পড়া যাবে না, মানা যাবে না।

আপত্তির নিরসন :

ফাযায়েলে আ'মাল কিতাবে আকীদা ও আহকাম সংক্রান্ত কোন হাদীস উল্লেখ করা হয়নি। কেবল বিভিন্ন বিষয়ের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস সংকলিত করা হয়েছে। তাই মূল আপত্তির জবাব বুঝতে প্রথমে তিনটি বিষয় ভালোভাবে জেনে নিতে হবে-

(ক) ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীস কী মানের হতে হয়?

(খ) পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের সংকলিত ফাযায়েলে আ'মাল সংক্রান্ত কিতাবগুলোর পর্যালোচনা।

(গ) ফাযায়েলে আ'মালে সংকলিত হাদীসগুলোর মান ?

ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীস কী মানের হতে হয়?

যে কোন হাদীসের মান নির্ণয়ের মাপকাঠি হল ঐ হাদীসের সনদ তথা বর্ণনাসূত্র। সনদের বিচারেই কোনো হাদীস সহীহ, হাসান, যয়ীফে য়াসীর (কম দুর্বল), যয়ীফে শাদীদ (অতিশয়

দুর্বল) সাব্যস্ত হয়। আবার কোনো কোনো বর্ণনা মউযূ' বা জাল প্রমাণিত হয়। উল্লিখিত প্রত্যেক প্রকার হাদীসের হুকুম অর্থাৎ কার্যকারিতা এক নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। যেমন জাল হাদীস তো কোন হাদীসই নয়; তা মানা বা গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না। আকাইদ, ফরয, ওয়াজিব, হারাম ও মাকরূহে তাহরীমী পর্যায়ের বিধানাবলী প্রমাণের জন্য হাদীসটা সহীহ বা হাসান মানের হতে হয়। কিন্তু ফায়ায়েল (আমলের ফযীলত), তারগীব (আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ), তারহীব (গুনাহের প্রতি ভীতি প্রদর্শন) ইত্যাদি প্রমাণের জন্য হাদীসটা সহীহ বা হাসান হওয়া জরুরী নয়। বরং হাদীস যয়ীফ হলেও তার দ্বারা ফাযায়েল প্রমাণিত হয়– তিনটি শর্ত সাপেক্ষে-

(ক) যয়ীফে শাদীদ তথা অতিশয় দুর্বল না হওয়া।

(খ) যয়ীফ হাদীসটা কোন 'আস্লে আম' তথা মূলনীতির অধীনে হওয়া।

(গ) উক্ত যয়ীফ হাদীস অনুযায়ী আমল করার সময় হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুপ্রমাণিত হওয়ার প্রতি পূর্ণ একীন না হওয়া। (ফাতহুল মুগীস ১/৩৫১)

সকল যুগের মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমামগণের মত হল, কোন আমলের ফযীলত প্রমাণের জন্য উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে যয়ীফ হাদীসই যথেষ্ট। অনেক বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নববী রহ. প্রমুখের মতে তো যয়ীফে শাদীদ অর্থাৎ অতিশয় দুর্বল বর্ণনার হাদীস দ্বারাও ফাযায়েল প্রমাণিত হয়।

পূর্ববর্তীদের ফাযায়েলে আ'মাল সংক্রান্ত কিতাবসমূহের অবস্থা/পর্যালোচনা

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর ফাযায়েলে আ'মাল কোন নতুন বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত কিতাব নয়। শাইখ যাকারিয়া রহ.এর পূর্বে মানুষদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং গুনাহের কাজ থেকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকেই স্বতন্ত্রভাবে ফাযায়েল, তারগীব-তারহীব, আদাব-আখলাক, দুনিয়া বিমুখতা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ লেখা শুরু হয়েছে। এগুলো কেবল তালিকা তৈরি করলেই একটি পুস্তিকার রূপ নিবে। নিম্নে শুধু ১০টি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল-

(১) কিতাবুয যুহদ; আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (মৃত ১৮১ হি.)।
(২) ফাযাইলুল কুরআন; ইমাম শাফিয়ী (মৃত ২০৪ হি.)।
(৩) কিতাবুয যুহদ; ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃত ২৪১ হি.)।
(৪) আল-আদাবুল মুফরাদ; ইমাম বুখারী (মৃত ২৫৬ হি.)।
(৫) কিতাবুল আদাব; ইমাম বাইহাকী (মৃত ৪৫৮ হি.)।
(৬) তারগীব তারহীব; ইবনে শাহীন (মৃত ৩৮৫ হি.)।
(৭) তারগীব তারহীব; আব্দুল আযীম আল-মুনযিরী (মৃত ৫৫৬ হি.)।
(৮) আ'মালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ; ইমাম নাসায়ী (মৃত ৩০৩ হি.)।
(৯) আল-আযকার; ইমাম নববী (মৃত ৬৭৬ হি.)।
(১০) আল-কউলুল বাদী'; হাফেয সাখাবী (মৃত ৯০২ হি.)।

এ স্বল্প পরিসরে প্রতিটি কিতাব নিয়ে পর্যালোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, ফাযায়েল, তারগীব-তারহীব, যিকির-আযকার ইত্যাদি বিষয়ক কোন কিতাব যয়ীফ হাদীস এমনকি যয়ীফে শাদীদ থেকেও মুক্ত নয়। সুতরাং ফাযায়েলে আ'মাল কিতাবের কারণে হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর উপর অভিযোগ উত্থাপন করা মূলত এই ধারার সমস্ত আলেমের ওপর অভিযোগ উত্থাপন করার নামান্তর। হযরত শাইখুল হাদীস রহ.এর রচনা মূলত পূর্ববর্তী শতাব্দীর মনীষীগণের চেষ্টা ও পরিশ্রমের অনুরূপ এক মহান কীর্তি। তিনি নিজ কিতাবে যেখানে যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেখানে তার উৎসও উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে ঐ হাদীসের সমর্থক ও অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করতে ভুলেননি। তাই এই কিতাবে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে অভিযোগ করা মূলত ঐ সকল হাদীস সংকলকদের উপর অভিযোগ করার নামান্তর, যাদের কিতাব থেকে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. ফাযায়েলে আ'মাল কিতাব রচনায় সহযোগিতা নিয়েছেন। তিনি ৫৪টির মত কিতাবের সহযোগিতায় এ কিতাবটি রচনা করেছেন। বিশেষত তারগীব-তারহীব, মুসতাদরাকে হাকিম, মাজমাউয যাওয়াইদ, জামে' সগীর, মিশকাতুল মাসাবীহ, জামউল ফাওয়াইদ, আল-কউলুল বাদী', ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, তামবীহুল গাফিলীন, কুররাতুল উয়ূন প্রমুখ কিতাবের সহযোগিতা নিয়েছেন।

সুতরাং ফাযায়েলে আ'মাল কিতাবে যয়ীফ হাদীস বর্ণনা করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে উপরোক্ত যেসব মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের রচিত কিতাবসমূহ থেকে ফাযায়েলে আ'মাল কিতাব রচনায় সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, তাদেরকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে হয়!

(গ) ফাযায়েলে আ'মালে সংকলিত হাদীসগুলোর মান :

শাইখ লতীফুর রহমান বাহরাইজী কাসেমী দা.বা. এর তাহকীক ও গবেষণা অনুযায়ী পুরো ফাযায়েলে আ'মালে আরবী বাক্য বা মতন উল্লেখ আছে মোট ৩৭৭টি হাদীসের। তার মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১৫৯টি, হাসান হাদীসের সংখ্যা ৮৩টি এবং যয়ীফ (সামান্য দুর্বল) হাদীসের সংখ্যা ১২২টি। এই মোট ৩৬৪টি হাদীস। যয়ীফে শাদীদ হাদীসের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৬টি। তিনি (লতীফুর রহমান সাহেব দা.বা.) সনদ খুঁজে পাননি অথবা সনদে উল্লিখিত কোন কোন রাবীর খোঁজ পাননি এমন হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৭টি।

সুতরাং এই কিতাবের ৩৬৪টি হাদীসের দ্বারা ফাযায়েল প্রমাণিত হতে কোন সমস্যা নেই। কারণ তার মধ্যে রয়েছে সহীহ, হাসান ও যয়ীফে য়াসীর।

সহীহ থেকে যয়ীফে য়াসীর পর্যন্ত সকল হাদীস দ্বারা ফাযায়েল প্রমাণিত হওয়া নিয়ে কোন মতানৈক্য নেই, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বাকি থাকে ৬টি যয়ীফে শাদীদ তথা অতিশয় দুর্বল হাদীস ও সনদবিহীন ৭টি হাদীস। এছাড়া ফায়দা অংশে গ্রহণযোগ্য হাদীসের পাশাপাশি কিছু অতি দুর্বল হাদীসও এসে গেছে। তবে ফায়দা অংশে কী পরিমাণ গ্রহণযোগ্য হাদীস আছে, আর কী পরিমাণ অতি যয়ীফ হাদীস আছে, তার পরিসংখ্যান এখন উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যেহেতু এ বিষয়ে কোন গবেষণালব্ধ ফলাফল আমাদের সামনে আসেনি। বর্তমানে একাধিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে আমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারব, ইনশাআল্লাহ। তবে মূল অংশের ন্যায় ফায়দা অংশেও যে অতি দুর্বল হাদীস সামান্যই আছে তা সকলের কাছেই স্পষ্ট। আর কোন কিতাবে দু-চারটি ভুল পাওয়া গেলেই তা পাঠ করা হারাম, কুফর, শিরক বলা বিবেকবান মানুষের কাজ হতে পারে না। নবীগণ ব্যতীত কারো পক্ষে ভুলমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়; সাধারণ উম্মতের বৃহত্তর কাজে কিছু ভুল থাকতেই পারে। হ্যাঁ, সংকলক কিংবা তার কোন অনুসারী কর্তৃক সে

ভুলকে অস্বীকার করা বা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা নিশ্চয় নিন্দনীয়। যেমনটা ঘটেছে নিকট অতীতের কোন কোন গবেষক ও তাদের অনুসারীদের দ্বারা। আলহামদুলিল্লাহ! ফাযায়েলে আ'মাল কিতাবের লেখক কিংবা পাঠক কেউ এমন হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

২নং আপত্তি : তাদের দ্বিতীয় আপত্তি হল, এতে প্রচুর পরিমাণে কারামত ও অস্বাভাবিক ঘটনা বিদ্যমান, তাই এ কিতাব গ্রহণ করা যাবে না, পড়া যাবে না।

আপত্তির নিরসন :

তাদের আপত্তি থেকে বুঝা যায় তারা কারামত ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে অস্বীকার করে, এগুলোকে শরীয়তের খেলাফ মনে করে। অথচ তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। স্বয়ং কুরআন-হাদীসেই প্রচুর কারামত ও অস্বাভাবিক ঘটনা বিদ্যমান। তাছাড়া শুধু বাতিল ফেরকা 'মুতাযিলা' ব্যতীত কেউ এটা অস্বীকার করেনি। এমনকি সমালোচকদের মান্যবর ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান প্রমুখ আলেমগণ তো স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন এবং জোরে-শোরে তাদের কিতাবে বিভিন্ন কারামত উল্লেখ করেছেন। দেখুন, মাজমূয়ায়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া (১১/২০৫), নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের আল-ইনতিকাদ (পৃষ্ঠা ৫১), কুতফুস সামার (পৃষ্ঠা ৯৯)। আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন আকীদাতুত ত্বহাবী (পৃষ্ঠা ৫৯), আল-ফিকহুল আকবার (পৃষ্ঠা ১৪৪), শরহু আকীদাতুত ত্বহাবী; ইবনে ইয (পৃষ্ঠা ৫৮৩) যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা (১/২৯০, ৩০৬, ৩৮৪, ২/২৬৯, ৩৫৮) বিদায়া-নিহায়া (১১/১১৩), সিয়ারু আলামিন নুবালা (১০/১০৭, ১১/২৩০, ২৪৮, ১৭/২১৫, ১৯/৫৩), তারীখে বাগদাদ (১/১২১, ১২২, ১২৩, সিফাতুস সাফওয়া (২/১৯৭) ইত্যাদি।

এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফাযায়েলে আ'মালের ওপর উত্থাপিত আপত্তি বিদ্বেষপ্রসূত ও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভ্রান্ত গোষ্ঠির বিভ্রান্তি থেকে হিফাযত করুন এবং ফাযায়েলে আ'মাল কিতাব থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

লেখক : গবেষক ও শিক্ষানবিস, উলূমুল হাদীস ও ইফতা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

(১৭নং পৃষ্ঠার পর; প্রযুক্তির বাঁধভাঙ্গা...)

সরাসরি মানুষকে দাওয়াত দিই না কেন? আমি গায়েবী বন্ধুদেরকে ফেসবুকের মাধ্যমে নামাযের দাওয়াত দিচ্ছি, কিন্তু মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনসহ আশপাশের শত শত বেনামাযী মানুষকে কেন নামাযের দাওয়াত দিচ্ছি না? কেন প্রযুক্তির অন্ধকার ও বিপদসঙ্কুল পথে আমাদের এত আগ্রহ। আল্লাহওয়ালা বানানোর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিবে ইলম ও নবীন আলেমদের দীন প্রচারের নামে প্রবৃত্তিপূজার দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে দেখছি আর বেদনাদগ্ধ হচ্ছি।

আমি একথা বলছি না যে, প্রযুক্তির সাহায্যে দীন প্রচার ও বাতিলপন্থীদের বিভ্রান্তির জবাব দেয়া যাবে না। অবশ্যই প্রযুক্তিকে দীনী কাজে ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বিশাল জনগোষ্ঠি বিশেষ করে তরুণদেরকে দীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। লা-মাযহাবী, বিদআতী ও নাস্তিক-মুরতাদদের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার থেকে মুসলমানদের দীন ও ঈমানকে হিফাযত করতে হবে। কিন্তু সেখানে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা ও বাতিলের জবাব দেয়ার জন্য দা'য়ীর মাঝে নিম্নোক্ত যোগ্যতাগুলো অবশ্যই পাওয়া যেতে হবে-

১. কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের পর্যাপ্ত ইলমের অধিকারী হতে হবে।

২. ঈমান ও আমলে পরিপক্ক হতে হবে।

৩. গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিজের উপর আস্থাশীল হতে হবে।

৪. (লিখিত দীন প্রচারের ক্ষেত্রে) সাহিত্য ও লেখা-লেখির যোগ্যতা থাকতে হবে। কেননা শুধুমাত্র লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার করার নাম দীন প্রচার নয়।

৫. যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমি যে পন্থায় দীন প্রচার করতে চাই তা শরীয়ত অনুমোদিত কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে এবং কোন আল্লাহওয়ালা মুরুব্বীর সামনে বিষয়টি বিস্তারিত পেশ করে তার মশওয়ারা নিতে হবে। পরবর্তীতে মাঝে মাঝে তাকে হালত জানিয়ে দু'আ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিতে হবে।

৬. যারা মুরুব্বীগণের ছত্রছায়ায় এপথে সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কাছ থেকে প্রযুক্তি ব্যবহারের নিরাপদ পন্থা ও দীন প্রচারের পদ্ধতি জেনে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আমাদের দীন প্রচার শুধু প্রচারের জন্য নয়, বরং আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য। সুতরাং দীন প্রচারের নামে আল্লাহর নাফরমানীর কোন অবকাশ নেই।

কুরআনে কারীমের يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (অর্থ : তারা মদ ও জুয়া সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়টির মধ্যে একটি বিরাট গুনাহ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও রয়েছে। তবে এ দু'টোর উপকারিতার চেয়ে গুনাহটি অনেক বড়। সূরা বাকারা- ২১৯) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. বলেছেন, اثم (গুনাহ) একবচন এনেছেন। আর منافع (উপকারিতা) বহুবচন এনেছেন। এর দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, কোন জিনিসে বা কোন কাজে যদি হাজারো লাভ থাকে কিন্তু তাতে একটি গুনাহও থাকে তাহলে সে হাজারো উপকারিতা এক গুনাহের সামনে তুচ্ছ ও ম্লান হয়ে যাবে। কেননা যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি চাই তা অতি অল্পই হোক না কেন অনেক বড় দৌলত। ورضوان من الله اكبر (আল্লাহ তা'আলার সামান্য সন্তুষ্টিও অনেক বড়)। অনুরূপ আল্লাহর সামান্য অসন্তুষ্টিও অনেক বড় বিপদের কারণ। (খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত ২/১৭৬)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রযুক্তির বাঁধভাঙ্গা সয়লাবের মুখেও সকল গুনাহ থেকে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে একজন আল্লাহওয়ালার কবিতার মাধ্যমে শেষ করছি,

میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں،

میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے۔

'যেখানেই থাকি যে পরিবেশেই থাকি/
তাকওয়া যেন সদা নিরাপদ থাকে।'

লেখক : পরিচালক, মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া, বছিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। খতীব, আজিমপুর পার্টি হাউজ কলোনি মসজিদ।

আবেগপ্রবণ বাঙালীর তীর্থস্থান মাজার-দরগা

মাওলানা হাফিজুর রহমান

মাজার দরগার অর্থ

মাজার আরবী শব্দ। ব্যাকরণিক ভাষায় এটি 'যরফে মাকান' তথা স্থানাধিকরণ। ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে গুরুস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তির সমাধিস্থল বা কবর, যিয়ারতের স্থান। আর দরগা ফারসী শব্দ। অর্থ রাজসভা, আশ্রম, আস্তানা, পুণ্যবান ব্যক্তির সমাধি। সংসদ বাংলা অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে, পীরের কবর ও তৎসংলগ্ন পবিত্র স্মৃতিমন্দির। বাংলাপিডিয়াতে দরগার সংজ্ঞা উল্লেখ করে চমৎকার একটি মন্তব্য যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'দরগাহ ওলী-আওলিয়ার কবরস্থান। ইসলামী শরীয়ত মতে কবরের ওপর কোনরূপ ঘর ও গম্বুজ নির্মাণ নিষিদ্ধ। তবে কবরকে চিহ্নিত করার জন্য জমিনের স্তর থেকে ১০ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু করা যেতে পারে। দরগাহে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতি জ্বালানো নিষিদ্ধ; তবে দরগাহ এবং গোরস্থান যিয়ারত করা সওয়াবের কাজ। (বাংলাপিডিয়া ৬/৬৮)

মাজার সংস্কৃতির গোড়ার কথা

আদম আ. থেকে নিয়ে নূহ আ. পর্যন্ত সকল মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এক ও অভিন্ন ছিল। নূহ আ. এর পর শয়তানের প্ররোচনায় উম্মাহর মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। স্রষ্টার উপাসনা থেকে সৃষ্টির উপাসনার ধারা প্রবর্তিত হয়। ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উদ্দ, সুওয়া, ইয়াউক, নাসর– এগুলো মূলত নূহ আ. এর সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের নাম ছিল। যখন তারা পরলোকগমন করেন তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কুমন্ত্রণা দেয়, তোমরা তাদের অধিষ্ঠানস্থলে তাদের প্রত্যেকের নামে একেকটি মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের নামে সেগুলোর নামকরণ করো। শয়তানের কুমন্ত্রণা মতে তারা তাদের প্রত্যেক সৎকর্মশীল ব্যক্তির নামে একেকটি মূর্তি তৈরি করে এবং তাদের নামে সেগুলোর নামকরণ করে। তখনো তাদের নামে এ মূর্তিগুলোর পূজা-অর্চনার সূচনা হয়নি। কিন্তু সে প্রজন্মের সকলে যখন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে এবং মূর্তি স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অজ্ঞাত হয়ে যায় তখন থেকে সে মূর্তিগুলোর পূজার ধারা সূচিত হয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৬৩৬)

আয়িশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন উম্মে হাবীবা এবং উম্মে সালামা রাযি. খ্রিস্টানদের একটি গির্জা সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। তারা আবিসিনিয়াতে (বর্তমান ইথিওপিয়া) গির্জাটি দেখেছিল। গির্জাটির নাম ছিল মারিয়া। তারা গির্জাটির সৌন্দর্য এবং তার মধ্যে রক্ষিত ছবি সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠালেন এবং বললেন, যখন তাদের কোন সৎলোক ইন্তেকাল করত তখন তারা তাদের কবরের উপর উপাসনালয় নির্মাণ করত। এরপর সেখানে সেসব ছবি রাখত। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচাইতে বেশি নিকৃষ্ট। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩১৮১)

কাজি ইয়ায রহ. বলেন, এ কবরপূজাই ছিল মূর্তিপূজার সূচনাপর্ব। পূর্বযুগে যখন কোন নবী বা সৎ লোক ইন্তেকাল করত তখন তার ভক্তরা তার মূর্তি তৈরি করত এবং তার কবরের উপর উপাসনাগার নির্মাণ করত। যাতে সে ছবি দেখে তারা প্রশান্তি ও ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। তারা সে মূর্তিগুলোর নিকট আল্লাহর ইবাদত করত। এভাবে কয়েক যুগ চলে যায়। পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পিতা এবং পিতামহদেরকে মূর্তির নিকট উপাসনা করতে দেখেছে। কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেনি। এ সুযোগে শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দেয়, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা এ মূর্তিগুলোর পূজা করত। ফলে তারা সেগুলোর পূজা করতে শুরু করে। মূর্তিপূজার এ সূচনা ইতিহাস যে একটি সত্য ইতিহাস সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসটিই প্রমাণ করে। আতা ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না যেখানে ইবাদত উপাসনা করা হবে। ঐ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলা মর্মন্তুদ অভিশাপ বর্ষণ করুন যারা তাদের নবীদের কবরকে সেজদার স্থলে পরিণত করেছে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৩৫২, মুয়াত্তা মালেক; হা.নং ৫৯৩, ইকমালুল মু'লিম শরহু সহীহি মুসলিম ২/২৫১, ইকাযুল আফহাম ফী শারহি উমদাতিল আহকাম ৩/৭০)

জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী এবং সৎকর্মশীলদের কবরগুলোকে মসজিদ তথা সিজদার স্থলে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে সিজদার স্থলে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করছি। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১২১৬)

কবরপূজার সূচনাকারী লোকগুলো থেকে ইয়াহুদীরা লুফে নেয় তাদের পঙ্কিল চিন্তাধারা। ফলে তারাও আম্বিয়ায়ে কেরামের কবরকে পূজা করে আল্লাহ তা'আলার অভিশম্পাত কুড়িয়েছে। আর তাদের থেকে খ্রিস্টান জগত কবরপূজায় অংশগ্রহণ করে তাদের আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানদের ধ্বংস করে দিন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ তথা সিজদার স্থলে পরিণত করেছে। আয়িশা রাযি. বলেন, যদি রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি না বলতেন তবে তাঁর কবরকে দৃশ্যমান করে রাখা হতো। কিন্তু আশঙ্কা করা হয়েছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরকে সিজদার স্থলে পরিণত করা হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৩৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১২১২)

ব্যক্তিপূজা থেকে মাজারপূজার সূচনা

ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এগুলো ইসলামী শরীয়ার অন্যতম একেকটি অনুষঙ্গ। কোন ব্যক্তির মাঝে যদি এসব সৎগুণের অভাব থাকে তবে তার ঈমানের মাঝেও ঘাটতি দেখা দেয়। কুরআন-হাদীসে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার রূপরেখা এবং পরিসীমাকে বেশ স্পষ্ট করেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ সীমারেখা অতিক্রম করলেই শিরক-বিদআতের মত অমার্জনীয় অপরাধের জন্ম হয়। উদ্দ, ইয়াগুস, ইয়াউক নামের সৎলোকগুলোকে তাদের স্বজাতির লোকেরা ভালোবেসেছিল। কিন্তু এ ভালোবাসা ছিল লাগামহীন। মানুষকে ভালোবাসতে হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসাকে মাধ্যম বানাতে হয়। এ মাধ্যম বা মিডিয়া উঠে গিয়ে যদি মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ডাইরেক্ট হয়ে যায় তখনই বাধে যত্তসব বিপত্তি। সূচিত হয় অমার্জনীয় অনাচার-অবিচার। আজ আমাদের সমাজে যে কবরপূজা বা মাজারপূজার প্লাবন দেখি তার বীজ বপিত হয় ব্যক্তির প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি ভালোবাসা থেকেই। লাগামহীন এ ভালোবাসার নৈতিকতার দিকটি আমরা তলিয়ে দেখতে চাই না। কারণ আমরা যে হুজুগে বিশ্বাসী। কেউ একজন বলল, ঐ মাজারে এই হয় সেই হয়। ব্যস, দে ছুট। পেছনে ফিরে দেখার সুযোগ আর হয় না। ঐ মাজারে গিয়ে নানা রকম অনাচারমূলক কীর্তিকলাপে বুঁদ হয়ে অর্থ-সম্পদসহ সাধের ঈমানটিকে বলি দিয়ে তবেই কেবল ক্ষান্ত দেই। এই হল আমাদের হুজুগেপনা চরিত্রের পরিণতি। অথচ হাদীসে মাজারকেন্দ্রিক উৎসব উপাসনার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার কবরকে উৎসব-অনুষ্ঠানে পরিণত করো না। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৫০৪৪) আতা ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না যেখানে ইবাদত-উপাসনা করা হবে। ঐ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলা মর্মন্তুদ অভিশাপ বর্ষণ করুন যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ২৩৫২, মুয়াত্তা মালেক; হা.নং ৫৯৩)

বাংলাদেশে মাজার দরগার পরিসংখ্যান

বাংলাদেশে ঠিক কয়টি মাজার বা দরগা রয়েছে আমাদের জানামতে এ নিয়ে সুপুঙ্খ কোন জরিপ এখনো হয়নি। 'বাংলাদেশের মাজার ইনসাইক্লোপিডিয়া' শিরোনামে মাজার বিষয়ক বিশ্বকোষ প্রস্তুতির উদ্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিজম বিভাগ অনলাইনকেন্দ্রিক একটি উদ্যোগ নিয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য এ সংক্রান্ত একটি ঘোষণাপত্র যথারীতি প্রচারিত হচ্ছে। জানি না কী উদ্দেশে তাদের এ উদ্যোগ। মাজারচর্চাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই কি তাদের এ গবেষণা আয়োজন, না নিছক গবেষণার জন্যই গবেষণা তাদের উদ্দেশ্য? কিন্তু এখনো তাতে কোন সাড়া মেলেনি। তবে চট্টগ্রাম জেলার চান্দনাইশ থানায় অবস্থিত মাজারগুলোর একটি তালিকা আমরা হাতে পেয়েছি। এ থানায় পৌরসভাসহ নয়টি ইউনিয়ন রয়েছে। তালিকাটিতে ইউনিয়ন ভিত্তিক মাজারের পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। সেখানে মোট মাজারের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ১৩৬টি। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে জরিপ করা হলে কোন কোন থানার মাজারের সংখ্যা উক্ত সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগে মাজার দরগার সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশি। বাংলাদেশে মোট ৫৫০টি থানা রয়েছে। আনুমানিক হিসেবে প্রতিটি থানার মাজার সংখ্যা গড়ে ২০টি করেও ধরা হলে বাংলাদেশের মাজার দরগার আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়ায় ১১০০০।

কিম্ভূতকিমাকার মাজার দরগার পসরা

মাজারস্থ মাটিতে যে ব্যক্তিটি শায়িত আছেন তার সম্বন্ধে না জেনে আমরা কোন ধরনের বিরূপ মন্তব্য করতে পারি না। কারণ আজকের পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিশ্ববরেণ্য আওলিয়ায়ে কেরামের অসংখ্য মাজার-দরগা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেখানে সকাল-সন্ধ্যা শিরক বিদআতের উন্মাতাল আয়োজন চলে। যেগুলো একসময় পবিত্র কবর ছিল আজ সেগুলো মাজার নামের শিরক বিদআতের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অনৈতিক এ আয়োজনের কারণে শায়িত মনীষীদের ব্যাপারে আমরা কোন মন্তব্য করতে পারি না। কিন্তু যখন আমরা মাজারের নেমপ্লেটে অদ্ভূতুড়ে নাম প্রত্যক্ষ করি তখন আমাদের মনে বিষম রকমের সংশয় জাগ্রত হয়, আসলেই কি এখানে কেউ শায়িত আছেন? শায়িত থাকলেও তিনি কি কোন ভালো মানুষ ছিলেন, নাকি সেটা নিছক কোন ইকোনোমিক সেন্টার? ইত্যকার হাজারো রকমের প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। সংশয়াকুল এ জাতীয় কিছু বিচিত্র মাজারের নাম নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. কালু শা'র মাজার।

২. বারো আউলিয়ার মাজার। সুনামগঞ্জ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং মুন্সিগঞ্জে এ নামে ছয়টি মাজার রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এক সাথে বারোজন ওলীর সমন্বয় কি করে হলো? তারা কি যৌথভাবেই ইন্তেকাল করেছিলেন নাকি পর্যায়ক্রমে ইন্তেকাল করেছিলেন? এরপর যে প্রশ্নটি সৃষ্টি হয় তা হলো, তাদের মাজার একাধিক জায়গায় হলো কী করে? নাকি প্রত্যেক বারোজন ওলীই স্বতন্ত্র। এক বারোর সাথে আরেক বারোর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই?

৩. গাজি কালু চম্পাবতির মাজার। এরা কারা? এ নামে কোনো মানুষ কি এ দেশে ছিল, নাকি এরা রূপকথার নায়ক নায়িকা? এ নিয়ে রয়েছে অজেয় রহস্য। কিন্তু এদের নামে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য মাজারের দেখা মিলে। শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পাহাড়ি টিলায় এ নামে একটি মাজার রয়েছে। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ

নামের মাজার তো বাংলাদেশের নানা জায়গায় দেখা যায়। এর কারণ কি? তিনি বলেছিলেন, তারা বাংলাদেশের যেখানে যেখানে গিয়ে বসেছেন সেখানেই একেকটি মাজার তৈরি হয়েছে। ভাগ্যিস কোন কারিশমা-কারামাতের কথা বলেননি! উত্তরটা কিছুটা হলেও যুক্তিতে ধরে। সেই সাথে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, ঐ মাজারস্থ মাটির তলায় কিছুই নেই। ওখানে একখানা হাড়গোড়েরও হয়তো সন্ধান পাওয়া যাবে না। এ নামে ঝিনাইদহে একটি মাজার রয়েছে। জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ১৪২৪৯৩/- টাকা ব্যয়ে মাজারটি নির্মাণ করা হয়। প্রশাসনের এ কেমন মাজার প্রীতি? মানুষ খেতে পায় না। অথচ কল্পিত মাজার নির্মাণে ব্যয় হয় খেটে খাওয়া মানুষের লাখ টাকা!

৪. চাষনী পীরের মাজার।

৫. কলন্দর শাহের মাজার।

৬. বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার। এটা যে একটি অলীক মাজার এ ব্যাপারে সামান্যতম সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ এটা ইতিহাস স্বীকৃত একটি বাস্তবতা, তিনি ইরানের বিস্তাম (বর্তমানে বস্তাম; তবে বিশুদ্ধ বিস্তাম) নগরীতে ইন্তেকাল করেছেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়েছে। এখন চট্টগ্রামে বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার নামে যা হচ্ছে তা সবই মিথ্যার বেসাতি বৈ কিছুই নয়। যাকে চুরির উপর সিনা জুরি বলা চলে। একটি মিথ্যা কবরকে কেন্দ্র করে শিরক বিদআতের মহাযজ্ঞ চলছে।

৭. খিজির আ. এর খলীফার মাজার। মাজারটি আজিমপুর গোরস্তানেই রয়েছে। কি অদ্ভুত কাণ্ড। শায়িত ব্যক্তিটি খিজির আ. এর খলীফা হলেন কি করে? উন্মাদনারও একটি সীমানা থাকা চাই।

৮. ঠাণ্ডা শাহের মাজার। বাগেরহাট খানজাহান আলীর মাজারের সন্নিকটেই মাজারটি অবস্থিত।

৯. হযরত পীরু শাহের মাজার।

১০. তোতা শাহের মাজার।

১১. চেহেল গাজীর মাজার।

১২. গায়েবী পীরের মাজার। মাজারটি সিলেটে নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে অসংখ্য গায়েবী মাজার রয়েছে। অদৃশ্যভাবে নাকি রাতারাতি মাটি ফুঁড়ে মাজার বেরিয়ে আসে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সবাই শোনা কথা বলে। কেউ সচক্ষে দেখেছে, এমন ব্যক্তির সন্ধান মেলা ভার। মসজিদও নাকি গায়েব থেকে উত্থিত হয়। কিন্তু যখন এসব গায়েবী মাজার-মসজিদ নিয়ে গবেষণা হয় তখন থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। তখন দেখা যায়, এগুলো গায়েব টায়েব কিছু নয়; মুগল আমলের স্থাপনা। গায়েবী টায়েবী সব রূপকথার অলীক গুজব। গুজবে-হুজুগে মানব নির্মিত স্থাপনাও গায়েবী হয়ে যায়!

১৩. জংলী পীরের মাজার।

১৪. পুতুন শা'র মাজার।

১৫. সর্বকাজীর মাজার।

১৬. কম্বলী শা'র মাজার।

১৭. ফুল শা'র মাজার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত)।

১৮. মাক্কু শা'র মাজার (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশে অবস্থিত)।

১৯. তেল শা'র মাজার (কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন)।

২০. হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর মাজার। কি অদ্ভুত ব্যাপার! ইরাকের আব্দুল কাদের জিলানী রহ. বাংলাদেশে কি করে এলেন? তার মাজার তো ইরাকেই বর্তমান রয়েছে! মাজারের আধিক্যকরণ তো শিয়া সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। তারা ইরাক, সিরিয়া এবং মিশরে হুসাইন রাযি.এর নামে মাজার তৈরি করে পূজা করে। এমনকি তারা আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফে আলী রাযি.এর অলীক মাজার তৈরি করে কবরপূজার পসরা বসিয়েছে। সেখানে লাখ লাখ মানুষের সমাগম ঘটে। মিথ্যার কি শক্তি!

২১. হযরত বন্দি শাহের মাজার।

২২. পহর বাংলার মাজার।

২৩. পাঁচপীর মাজার।

২৪. খন্ডখুই মাজার।

২৫.লেংটা বাবার মাজার।

২৬. কল্লা শা'র মাজার (বি.বাড়িয়ার কসবায় অবস্থিত)।

২৭. গরম বিবির মাজার (মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন)।

এখানে উপমা হিসেবে কয়েকটি বিচিত্র মাজারের নাম দেয়া হলো। নতুবা ডাল চাল আর ঘোড়া শা'র মাজারসহ আরো কত ধরনের মাজার যে বাংলাদেশে রয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই!

(বাকি অংশ আগামী সংখ্যায়)

লেখক : শিক্ষাসচিব, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বছিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(১৫নং পৃষ্ঠার পর; অধীনস্তদের অধিকার)

সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরা রাযি.কে মদীনার গভর্ণর হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তিনি রাজি হননি। অনেক চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতেও রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত বলেছেন, আমার একটা শর্ত মেনে নিলে আমি এই দায়িত্ব নিতে পারি। জিজ্ঞাসা করা হল, কি সেই শর্ত? তিনি বললেন, আমি যে মসজিদে নববীতে আযান দিচ্ছি এই পদে আমাকে বহাল রাখতে হবে। তার একথা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। বোঝা গেল, চাপের মুখে মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি গভর্ণর হতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু এই পদের প্রতি তার কোন মোহ ছিল না। কেননা প্রজারা যত গুনাহ করবে রাষ্ট্রপ্রধান তা বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে সব রাষ্ট্রপ্রধানের আমলনামায়ও জমা হবে।

আমি অফিসের বস, তাহলে অফিসে যারা আমার অধীনস্ত তাদের ব্যাপারে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে। এই জবাবদিহীতা থেকে বাঁচার জন্য অধীনস্ত লোকদেরকে নামাযের কথা বলতে হবে, দীনের উপর চলার কথা বলতে হবে। পদের দায়িত্ববোধ, দীনী জযবা ও আন্তরিক মমতা দিয়ে তাদেরকে বোঝাতে হবে। এরপরেও যদি তারা না মানে তার জন্য আমি দায়ী হব না। যিনি কোন এলাকার এম.পি বা চেয়ারম্যান তাকে তার এলাকার লোকজনের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। যিনি কোন এলাকার মেম্বর বা কমিশনার তাকে এলাকার লোকের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। মোটকথা, যার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের পরিধি যতটুকু তাকে সেই পরিমাণে জবাবদিহী করতে হবে। এভাবে সকলে যখন সকলের হক আদায় করবে তখন সমাজে কোন অস্থিরতা, যুলুম-নির্যাতন থাকবে না। আমরা আবার ফিরে পাবো ইসলামের সোনালী যুগ।

লেখক : মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া খতীব, বাইতুস সুজূদ জামে মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

মাতৃজাতি

আদর্শ মা

মাওলানা মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম

মায়ের মর্যাদা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ জন্মের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা মাতা-পিতার মাধ্যমেই সমুন্নত রেখেছেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

অর্থ : হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন মানুষ হতে এবং সেই মানুষটি থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই দুইজন থেকে তিনি বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীতে মানুষ আগমনের মাধ্যম যদিও মাতা-পিতা উভয়েই কিন্তু মর্যাদা, খিদমত ও শ্রদ্ধার দিক থেকে মায়ের হক সবচেয়ে বেশি। কেননা মা'কে এমন কিছু কষ্ট ভোগ করতে হয় (সন্তান গর্ভে ধারণ করা, সন্তানকে লালন-পালন করা ইত্যাদি) যা পিতাকে ভোগ করতে হয় না। হযরত আদম আ. ব্যতীত পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন তারা সকলেই কোন না কোন মায়ের সন্তান। তাই কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মায়ের মর্যাদা অপরিসীম। হাদীসে আছে, জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাতা-পিতার মধ্যে সম্মান ও খিদমতের দিক থেকে কে বেশি হকদার? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার মা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তৃতীয় বার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? উত্তরে নবীজী আবারও বললেন, তোমার মা। চতুর্থ বার জিজ্ঞাসা করায় বললেন, তোমার পিতা। কেননা তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, লালন-পালন করেছেন, যা পিতাকে করতে হয়নি। এই হাদীস দ্বারা মায়ের মর্যাদা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

মা হবেন গুণাবলীর আধার

ইসলাম মাকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে তা শুধু সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার কারণেই নয়। বরং গর্ভধারণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত আদর্শ ও গুণাবলীর কারণেই সম্মানিত করা হয়েছে। কেননা সন্তানকে মহান ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আদর্শ মার যথাযথ ভূমিকা অপরিহার্য। একজন আদর্শ মা তার সন্তানকে স্নেহ-মমতা, আদর-সোহাগ ও উত্তম গুণাবলীর সমন্বয়ে আদর্শের মূর্ত প্রতীকরূপে গড়ে তুলবেন। যাতে সন্তানের অন্তরে মাতা-পিতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রতিফলিত হওয়ার পাশাপাশি মহান স্রষ্টার প্রতিও অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

মা'কে হতে হবে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত। শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-মমতা দীনী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাকওয়া, ইখলাছ, সততা, সবর, শোকর, বিনয় ও অল্পেতুষ্টির গুণে গুণান্বিত। পাশাপাশি লোভ, মিথ্যা, কৃপণতা, অহঙ্কার, অনিয়ন্ত্রিত গোস্বা ইত্যাদি মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র। বিশেষ করে সন্তানের জীবন গঠনে মাকে হতে হবে সর্বাধিক যত্নবান ও সতর্ক। অনৈসলামী ভাবধারা ও আদর্শ যেন আদরের সন্তানকে ধ্বংস করে না দেয় সেজন্য হতে হবে কর্তব্যে কঠোর। কেননা নেককার সন্তান মাতা-পিতার জন্য অনেক বড় নিয়ামত। আল্লাহর প্রিয় বান্দা আম্বিয়া আ.-ও নেক ও সৎ সন্তানের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট কেঁদে কেঁদে দু'আ করেছেন।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

অর্থ : হে প্রভু! আমাকে একটি নেক সন্তান দান করুন। (সূরা সাফ্‌ফাত-১০০)

আদর্শ মায়ের করণীয়

একজন আদর্শ মায়ের করণীয় হল, সর্বদা আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, নিয়ামতের যথার্থ কদর করা। রাগ-গোস্বাকে হযম করে মহব্বত আর ভালোবাসার মাধ্যমে সন্তানকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা। অতিশয় রাগ মুসলমানের ঈমানের নূর ও মাধুর্যকে ধ্বংস করে দেয়। মহব্বত দ্বারাই দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। মানব জীবনের পরিপূর্ণতা মনুষ্যত্ব লাভে আর নারীর নারীত্বের পরম স্বার্থকতা তার মাতৃত্বে।

নিখিল জাহানের পথ প্রদর্শক, জাতি গঠনে অনন্য দিশারী প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

অর্থ : পুণ্যবতী নারী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

মায়েদের আদর্শবান হওয়ার সহজ পথ হল, আদর্শের মূর্ত প্রতীক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা। উম্মাহাতুল মুমিনীন ও মহিলা সাহাবিয়্যাদের জীবনাদর্শকে নিজের জীবনের মডেল বানানো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ নারী তথা আদর্শ মায়ের গুণাবলী হিসেবে বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমাযান শরীফে রোযা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে ও স্বামীর কথা মেনে চলে, সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৪৭১)

দীনী বিষয়ে সচেতনতা

একজন আদর্শ মাকে দীনী বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। অনেক মহিলা এ ব্যাপারে অবহেলা করে থাকে। হায়েয-নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পরও গাফলতির কারণে কয়েক ওয়াক্ত নামায বিনা ওযরে কাযা করে দেয়। অথচ বিনা ওযরে নামায পরিত্যাগ করার ব্যাপারে হাদীসে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। নামায ছাড়াও অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটি কাজ সুন্নাত মোতাবেক করবে। কোন শিরক, বিদআত ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে না। গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নেবে, নিয়মিত কুরআনুল

কারীম তিলাওয়াত করবে, আমলী সূরাগুলো সময়মত পাঠ করবে। মোটকথা, একজন আদর্শ মায়ের কর্তব্য হবে, পাবন্দীর সাথে সুন্নাত মোতাবেক শরীয়তের সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলা।

মা হবেন স্বামী সোহাগিনী

একজন আদর্শ মায়ের কর্তব্য ও বৈশিষ্ট্য হল, স্বামীর অনুগত হওয়া। স্বামীর খিদমতে আত্মনিয়োগ করা, তার সম্পদের হিফাযত করা ও স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব বজায় রাখা। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, আল্লাহ পাকের কোন নাফরমানীর কাজে স্বামীর আনুগত্য করা যাবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

অর্থ : স্রষ্টাকে অসন্তুষ্ট করে কোন সৃষ্টির সন্তোষভাজন হওয়া জায়েয নয়।

স্বামীকে সাহস যোগাবে, বিপদাপদে স্বামীর জন্য সহজ হয় এমন পন্থা অবলম্বন করবে। সমস্যা, দুর্ভোগ ও দুঃখ-দুর্দশার সময় স্ত্রীর ধৈর্য ও দৃঢ়তার আঁচল উভয়ের পথ চলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে নবী পত্নীগণ, মুহাজির ও আনসার মহিলা সাহাবীগণের আদর্শকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করবে।

খোদাভীরুতা আদর্শ মায়ের অলঙ্কার

একজন আদর্শ মা হবেন তাকওয়া ও খোদাভীরুতার অনন্য গুণে গুণান্বিত। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাযি. রাতের বেলা শহর পরিদর্শনে বের হলেন। এক ছোট্ট কুটিরে মা-মেয়ের আলোচনা চলছে। মা মেয়েকে বলছে, ভোর হয়ে আসছে, জলদি দুধে পানি মিশিয়ে রাখো। মেয়েটি বলল, উম্মী! আমীরুল মুমিনীন তো দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। মা বলল, এখানে তো আমীরুল মুমিনীন নেই যে, তিনি দেখে ফেলবেন। মায়ের একথায় খোদাভীরু মেয়েটির উত্তর ছিল বড়ই সুন্দর ও চমৎকার! উম্মী! আমীরুল মুমিনীন হয়তো দেখবেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো দেখবেন। কথাটি শুনে হযরত উমর রাযি. বাড়ি ফিরে গেলেন। আর পরদিন সেই গরীব মেয়েটিকে আপন পুত্র আসেমের বধূরূপে ঘরে নিয়ে আসলেন। ঘটনা হয়তো এখানেই শেষ হতে পারতো; কিন্তু হল না। আল্লাহ তা'আলা মেয়েটিকে তার খোদাভীরুতার আরও প্রতিদান দিলেন। তার বংশেই জন্ম নিল ইসলামের পঞ্চম খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.।

মোটকথা, নেক ও মুত্তাকী সন্তানের গর্বিত মা হতে হলে তাকওয়া ও খোদাভীরুতার গুণে গুণান্বিত হওয়া প্রতিটি মায়ের জন্য খুবই প্রয়োজন।

সন্তান গর্ভে ধারণ ও লালন-পালনে আদর্শ মায়ের ভূমিকা

গর্ভবতী মায়ের কর্তব্য হল, গর্ভ নিশ্চিত হওয়ার পর আল্লাহ পাকের নিকট বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং নিজেকে ইবাদত-বন্দেগীতে নিয়োজিত রাখা। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার করতে থাকা। সেই সাথে নিজেকে সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ থেকে হিফাযত করা। বিশেষ করে পর্দা ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া, টিভি, ভিসিআর, সিনেমা ইত্যাদি দেখা, গীবত বা পরনিন্দা করা ইত্যাদি গুনাহ থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বেঁচে থাকা। আর নিয়ত করা যে, হে আল্লাহ! আমি অনাগত সন্তানটিকে দীনের খাদেম বানাবো, কুরআন তিলাওয়াত শেখাব, দীন শিক্ষায় শিক্ষিত করব, আল্লাহওয়ালা বানাবো। এভাবে গর্ভকালীন সময় অতিবাহিত করা।

সন্তান জন্মের পরপরই তার ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত দেয়া, কোন নেককার আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের মাধ্যমে তাহনীক (বুযুর্গের দ্বারা খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে তার কিছু অংশ বা চর্বিত খাদ্যের লালা শিশুর মুখে লাগিয়ে দেয়া) করানো, সাতদিনের দিন কোন সুন্দর অর্থবহ নাম নির্বাচন করা, মাথার চুল মুণ্ডিয়ে চুল সমপরিমাণ সোনা বা রূপা অথবা যে কোন একটির মূল্য সদকা করা, ছেলে হলে দু'টি আর মেয়ে হলে একটি ছাগল দিয়ে সন্তানের আকীকা করা, মাথার চুল মুণ্ডিয়ে চুল সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য অথবা যে কোন একটির মূল্য সদকা করা ইত্যাদি– পালনীয় সুন্নাতগুলোর ব্যাপারে সন্তানের পিতা বা অভিভাবককে স্মরণ করিয়ে দেয়া মায়ের কর্তব্য।

অতঃপর সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে একজন আদর্শ মায়ের কর্তব্য হল, নিজের সৎ গুণাবলী দ্বারা সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তোলা। কারণ শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। যা দেখে তাই শেখে। সুতরাং তার সামনে এমন কোন কাজ করা যাবে না, যার দ্বারা সে বদস্বভাব হয়ে যায়।

সর্বপ্রথম তার মুখে ইংরেজি অথবা অন্য ভাষার শব্দ না তুলে আল্লাহর নাম, কালিমাসহ বিভিন্ন উত্তম বিষয়াবলী শিক্ষা প্রদান করা। যখন সন্তান পড়ালেখার বয়সে উপনীত হবে তখন সর্বপ্রথম তাকে সম্ভব হলে নিজে অন্যথায় সবাহী মকতবে পাঠিয়ে কুরআনুল কারীম শিক্ষা প্রদান করা, উযূ, নামাযসহ ঈমান ও আমলের মৌলিক বিষয়গুলো হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা। পাশাপাশি সন্তানের স্বভাব চরিত্র ও নৈতিক বিষয়গুলোর প্রতি খুব লক্ষ্য রাখা। সততা, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠতা, দুনিয়া বিমুখতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তোলা। অপরদিকে অহঙ্কার, লোভ-লালসা, লৌকিকতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি বদ-আখলাক থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখা। সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায় তখন নামায আদায়ের ব্যাপারে হুকুম দেয়া আর যখন দশ বছর হয়ে যায় তখন প্রয়োজনে শাসনের মাধ্যমে হলেও নামাযের পাবন্দ বানানোর চেষ্টা করা। এভাবে একজন আদর্শ মা তার প্রিয় সন্তানকে নামাযসহ শরীয়তের অন্যান্য বিধানাবলীর প্রতি পাবন্দী করাবে এবং আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলবে। কেননা একজন আদর্শ মা সন্তানের জন্য একটি আদর্শ পাঠশালা। একজন আদর্শ মা-ই পারে পৃথিবীকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দিতে । আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন।

লেখক : শিক্ষাসচিব, মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

ইবাদাত

যুবাইর হুসাইন তাশফী
জামি'আ রাহমানিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

১৫২ প্রশ্ন : (ক) অনেকে বলে থাকেন, ফরয নামাযের কিরাআতে সূরা ফাতিহার আয়াতগুলো পৃথক পৃথক পড়া মুস্তাহাব। আবার অনেকে বলেন, মিলিয়ে পড়াতে কোন সমস্যা নেই। সঠিক মাসআলাটি জানালে উপকৃত হব।

(খ) জামায়াতে ইসলামী বা আহলে হাদীস ইমামের পিছনে ইকতিদা করা সঠিক কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : (ক) প্রশ্নে উল্লিখিত কথা দু'টির মাঝে কোন বিরোধ নেই। এ ব্যাপারে মাসআলা হল, নামাযের কিরাআতে সূরা ফাতিহার আয়াতগুলো পৃথক পৃথক পড়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতি আয়াতে ওয়াকফ করে পড়তেন। আর যদি একাধিক আয়াত একসাথে পড়ে ওয়াকফ করে তাতেও নামায হয়ে যাবে।

(সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৯২৭, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০০১, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৮২, সহীহ মুসলিম ১/১৬৯)

(খ) জামায়াতে ইসলামী দলের অনুসারী ইমামের পিছনে ইকতিদা : উপমহাদেশের নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের মতে জামায়াতে ইসলামী দলের কিছু মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন, তারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিষ্পাপ মানে না এবং সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে করে না। মওদুদী সাহেবের মনগড়া তাফসীরকে সঠিক তাফসীর ভেবে সাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চাকে বৈধ মনে করে। যে ইমাম জামায়াতে ইসলামীর এ জাতীয় আকীদা পোষণ করবে সে আকীদাগতভাবে ফাসিক। তার পিছনে নামায না পড়ে কোন বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন ইমামের পিছনে পড়া উচিত। তবে ঠেকায় পড়ে এমন ইমামের পিছনে নামায পড়া হয়ে গেলে তা আদায় হয়ে যাবে।

আহলে হাদীস ইমামের পিছনে ইকতিদা: বর্তমান যুগের 'আহলে হাদীস' চরম পর্যায়ের গোমরাহ এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বহির্ভূত একটি দল। তারা মাযহাব অনুসরণকে শিরক আর মাযহাবের অনুসারীদেরকে মুশরিক মনে করে। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সম্পর্কে কটূক্তি করে। এমন গোমরাহ আকীদাধারী লোকের পিছনে ইকতিদা করাও মাকরূহে তাহরীমী।

(মুসতাদরাকে হাকিম; হা.নং ৪৯৮১, মু'জামুল কাবীর লিত-ত্বাবারানী; হা.নং ৭৭৭, ফাতাওয়া শামী ১/৫৬০, ৫৬৩, ফাতাওয়া উসমানী ১/৪৪০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩৮৬, ইমদাদুল আহকাম ১/৫৩৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৩/৩১০)

মাহদী হাসান
টেপাখোলা, ফরিদপুর

১৫৩ প্রশ্ন : (ক) জানাযা নামাযে ইমাম সাহেব মায়্যিতের কোন বরাবর দাঁড়াবে?

(খ) এক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা উভয় বরাবর কি না?

(গ) জানাযা নামাযে যে ছানা পড়া হয় তাতে وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ বাড়াতে হবে কি না?

উত্তর : (ক), (খ) জানাযা নামাযের ইমামতিতে ইমাম সাহেব মায়্যিতের সিনা বরাবর দাঁড়াবেন। এক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা মায়্যিতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

(সহীহ বুখারী; [অধ্যায় : أين يقوم من المرأة والرجل] পৃষ্ঠা ১৬০, ই'লাউস সুনান ৮/২৭৫, বাদায়িউস সানায়ে ২/৪৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ১১৫৫১, ১১৫৫২, ফাতাওয়া শামী ২/২১৬, আল-বাহরুর রায়িক ২/৩২৬, ৩২৭, আহকামে মায়্যিত; পৃষ্ঠা ৭২, বেহেশতী যেওর ১১/৪৯৯)

(গ) জানাযা নামাযে যে 'ছানা' পড়া হয় তাতে وجل ثناؤك বাড়ানো জরুরী নয়। তবে বাড়ালেও কোন সমস্যা নেই।

(ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৮, বাদায়িউস সানায়ে ২/৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৪, আল-বাহরুর রায়িক ১/৩৯৩, উমদাতুর রি'আয়া আলা শরহিল বিকায়া ২/৩৬০, বেহেশতী যেওর ১১/৪৯৯, কিতাবুল মাসাইল ২/৮০, ফাতহুল কাদীর; পৃষ্ঠা ২৫, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/৩১১, ৩১২)

আবুল হাসান
শিবচর, মাদারীপুর

১৫৪ প্রশ্ন : (ক) এক ব্যক্তি একাকী মাগরিবের নামায নিঃশব্দে এক রাকাআত আদায় করার পর কিছু লোক তার পিছনে ইকতিদা করেছে। জানার বিষয় হলো, এখন উক্ত ব্যক্তি বাকি কিরাআত কীভাবে পড়বে?

(খ) মাসবূক তার ছুটে যাওয়া নামায কীভাবে আদায় করবে? এ ব্যাপারে কোন হাদীস আছে কি? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত কী এবং আমাদের আমল আবূ হানীফা রহ. এর মতানুযায়ী কি না?

(গ) গীবত করা কবীরা গুনাহ। অনেকে বলে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয। জানার বিষয় হলো, জায়েয সূরতগুলো কী কী?

উত্তর : (ক) উক্ত ব্যক্তি পরবর্তী রাকাআতে শব্দ করে কিরাআত পড়বে, যদি সে মুক্তাদিদের ইমামতির নিয়ত করে। আর যদি ইমামতির নিয়ত না করে, তবে শব্দ করে কিরাআত পড়া দ্বিতীয় রাকাআতেও তার জন্য আবশ্যক নয়। অবশ্য মুক্তাদিদের নামায উভয় অবস্থায় শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা পুরুষ মুক্তাদির নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয়।

(ফাতাওয়া শামী ১/৫৩২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/২৫১)

(খ) ইমামের সাথে যার কোন রাকাআত ছুটে যায় ফিকহের পরিভাষায় তাকে মাসবূক বলে। মাসবূকের ছুটে যাওয়া নামায কিরাআতের দিক থেকে প্রথম আর তাশাহহুদের দিক থেকে শেষ।

অতএব ইমামের সাথে যার প্রথম রাকাআত ছুটে গেছে, সে ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যথাক্রমে ثناء তথা سبحانك اللهم... তারপর أعوذ بالله... এবং بسم الله... পড়ে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা মিলাবে এবং রুকু সিজদার পর বৈঠক করে তাশাহহুদ, দুরূদ শরীফ ও দু'আ পড়ে সালাম ফিরাবে।

আর যার চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে কারও দু'রাকাআত ছুটে গেছে সে উভয় রাকাআতেই সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মিলাবে এবং দুই রাকাআত পূর্ণ করে শেষ বৈঠক করবে।

আর যদি তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম দুই রাকাআত ছুটে যায়, তাহলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর উঠে দাঁড়িয়ে যথারীতি ছানা ইত্যাদি পড়ে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে এক রাকাআত পড়ে বৈঠক করবে। এই বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়ে উঠে যাবে। অতঃপর সূরা মিলানোসহ আরেক রাকাআত পড়ে শেষ বৈঠক করবে।

আর যদি চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের তিন রাকাআত ছুটে যায়, তাহলে প্রথমে ছানা সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরাসহ এক রাকাআত পড়ে তাশাহহুদ পর্যন্ত বৈঠক করবে। অতঃপর উঠে ফাতিহার পর সূরাসহ এক রাকাআত পড়বে। অতঃপর আরেক রাকাআতে শুধু ফাতিহা পড়ে শেষ বৈঠক করবে।

মাসবূকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন সহীহ বর্ণনা রয়েছে।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك.

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ৬০২)

عن أبي هريرة رواية قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৪০০)

(ফাতাওয়া শামী ১/১০১, ৫৯৬, বাদায়িউস সানায়ে ১/৫৬৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫১৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৩৮৩)

(গ) গীবত একটি ভয়াবহ কবীরা গুনাহ। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফে একে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর হাদীস শরীফে গীবতকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও ঘৃণ্য কাজ বলা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য মারাত্মক এ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অবস্থায় অন্যের দোষ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ গীবতের আন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম নববী রহ. রিয়াযুস সালিহীন গ্রন্থে এবং ইমাম গাযালী রহ. ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোন জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তির গীবত করা তখনই মুবাহ তথা বৈধ হবে, যখন সেটা এমন কোন শরয়ী উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে করা হবে; গীবত করা ছাড়া যে উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এমন সূরত ছয়টি। যেগুলো নিম্নরূপ-

১. জুলুমের অভিযোগ করা। সুতরাং মজলুমের জন্য জায়েয আছে, এমন কোন ব্যক্তির নিকট জুলুমের অভিযোগ করে বিচার চাওয়া, যে ব্যক্তি জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখতে সক্ষম কিংবা মজলুমকে সান্ত্বনা দিতে বা সাহায্য করতে সক্ষম।
২. আল্লাহর নাফরমানী এবং গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও নৈতিকতার পথ প্রদর্শনের জন্য অন্যের সাহায্য কামনায় বলা যে, অমুক ব্যক্তি এমন এমন গর্হিত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, আপনি তাকে বিরত রাখুন ইত্যাদি।
৩. ইস্তিফতা তথা কোন মুফতী কিংবা বুযুর্গের নিকট একথা বলে সমাধান চাওয়া যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর এমন এমন জুলুম করছে, এর থেকে আমার মুক্তির উপায় কি?
৪. মুসলমানদেরকে কোন প্রকার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে, যেমন, বিবাহ-শাদী, অংশিদারী কারবার, কোন জিনিস আমানত রাখা কিংবা লেনদেন জাতীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কারো নিকট পরামর্শ চেয়ে কারো সম্পর্কে জানতে চাইলে, বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করা গীবত বলে গণ্য হবে না। তদ্রূপ বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়া, হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর অবস্থা বর্ণনা করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। বরং ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব। যেমন, কোন সাধারণ মানুষ যদি কোন বিদ'আতী কিংবা ফাসেক ও গোমরাহ লোককে আলেম এবং মুফতী মনে করে তার থেকে দীনদারীর বিষয়ে পরামর্শ নেয়, তবে তার সম্পর্কে মানুষকে সর্তক করা উলামায়ে কেরামের জন্য ওয়াজিব।
৫. যদি কোন ফাসেক কিংবা বিদ'আতী ব্যক্তি তার ফাসেকী ও বিদআতী কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে করে বেড়ায়, এমন ব্যক্তির প্রকাশ্যে কৃত ঐ সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কারো নিকট বলা গীবত হবে না।
৬. কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন বিশেষণে পরিচিত হয় যা তার কোন ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে– (যেমন, হাদীসের কিছু বর্ণনাকারী أعمش أعرج أصم أعور ইত্যাদি নামে পরিচিত। অথচ "أعمش" অর্থ দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, "أعرج" অর্থ ল্যাংড়া, "أصم" অর্থ বধির, "أعور" অর্থ কানা ইত্যাদি) এবং ঐ ব্যক্তি যদি লোকমুখে কেবল ঐ বিশেষণেই পরিচিত হয়, তবে ঐ বিশেষণে তাকে স্মরণ করা হলে গীবত হবে না। উল্লিখিত ছয়টি কারণ ছাড়াও আরো কিছু কারণ রয়েছে, যেগুলো উল্লিখিত কারণগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(সূরা হুজুরাত- ১২, শু'আবুল ঈমান লিলবাইহাকী; হা.নং ৬৩১৬, সহীহ বুখারী; হা.নং ২২১১, ৪৯০২, ৬০৩২, রিয়াযুস সালিহীন; হা.নং ৪৩২, ৪৩৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৮০, ১৭১৪, ২৭৭২, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/২৩৭, ফাতাওয়া শামী ৬/৪০৮, ৪০৯)

মু'আমালাত

শিবলী নোমান
রাজশাহী

১৫৫ প্রশ্ন : (ক) বর্তমান প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতে চাকুরী নেয়া বা চাকুরী নিয়ে থাকলে উক্ত চাকুরী অব্যহত রাখা জায়িয হবে কি না?

(খ) ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে ব্যাংকের মিনিমাম চার্জ দেয়া বৈধ হবে কি না?

(গ) সুদের টাকা দিয়ে ইনকাম ট্যাক্স আদায় করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : (ক) বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ইসলামের নাম ব্যবহার করা হয় এবং কাগজে কলমে ইসলামের কথা বলা হয় বটে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলোর অধিকাংশ লেনদেনে ইসলামী শরীয়া নীতির সঠিক বাস্তবায়ন হয় না। এসকল ব্যাংকে দায়সারা শরীয়া বোর্ড থাকলেও কর্মীদের মাঝে ও শরীয়া বোর্ডের মাঝে আবশ্যকীয় সমন্বয় থাকে না এবং শরীয়া বোর্ডের সদস্যদের কর্মীদের উপর কোন ধরনের কর্তৃত্বও চলে না। কাজেই আমাদের জানা মতে এগুলো সুদমুক্ত নয়। কম-বেশী সুদী লেনদেনের সাথে এরাও জড়িত আছে। তাই অন্যান্য সুদী ব্যাংকের ন্যায় প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকেও চাকুরী নেয়া উচিত নয়। যাদের গাফলতির কারণে এ ব্যাংকগুলোতে শরীয়া নীতির বাস্তবায়নে ত্রুটি হয় তাদের বেতন তো মোটেই হালাল নয়। আর যারা বিনিয়োগের

সাথে জড়িত নয় তাদের বেতনও সন্দেহ মুক্ত নয়। কাজেই এসব ব্যাংকেও চাকুরী গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেউ চাকুরীরত থাকলে তার কর্তব্য হল, অতি শীঘ্র অন্য হালাল চাকুরী গ্রহণ করা।
(সূরা মুমিনূন- ৫১, সূরা বাকারা- ২৭৭, ২৭৮, সূরা মায়িদা- ২, সুনানে কুবরা লিলবাইহাকী; হা.নং ১১৬৯৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৯৮, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৩৮৮, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২১৯৫৭, ফাতাওয়া শামী ৬/৫৫, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৯৬, ৩৯৭)
(খ) প্রচলিত ব্যাংকসমূহ তাদের ডিপোজিটরদের কাছ থেকে যে টাকা জমা নেয় শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তা করয বা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। এ ঋণ তারা নিজেদের মত ব্যবহার করে থাকে। আর ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণদাতার কাছ থেকে ঋণ বাবদ কোন ধরনের চার্জ আদায় করা অযৌক্তিক। তাই ডিপোজিটরদের দায়িত্বে ব্যাংক কর্তৃক মিনিমাম চার্জ আদায় করাও শরয়ী দৃষ্টিতে আবশ্যক নয়। সুতরাং ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ থেকে সে ব্যাংকের মিনিমাম চার্জ দিতে কোন সমস্যা নাই।
(গ) শুধুমাত্র সরকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদের টাকা দিয়ে সরকার কর্তৃক আরোপিত ইনকাম ট্যাক্স আদায় করা জায়িয হবে। কিন্তু কোন বেসরকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদের টাকা দিয়ে সরকারকে ইনকাম ট্যাক্স দেয়া জায়েয হবে না। বরং তা যাকাত গ্রহণের যোগ্য গরিবদের মাঝে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে।
(ফাতাওয়া শামী ২/৩৩৫, ৩৩৬, ৫/২৪৭, মুনতাখাবাতু নিযামিল ফাতাওয়া ১/১৯৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৪/৪৯৬)

আব্দুল্লাহ ফারহান
উত্তরা, ঢাকা

১৫৬ প্রশ্ন : 'ক' একটি সংস্থা। সংস্থাটি সমাজে সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করে। দরিদ্র, নিরক্ষর, পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্য সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করে। সরকারি অনুদানের জন্য সংস্থাটি একটি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। ১ কোটি টাকা মঞ্জুর হবে এ শর্তে যে, ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান ব্যবস্থাকারীকে দিয়ে দিতে হবে। 'ক' সংস্থা যদি অনুদানটি এ শর্তে গ্রহণ না করে তাহলে অন্য কোন সংস্থা এটি গ্রহণ করবে এবং প্রচলিত নিয়মে সমাজের উন্নয়নে কাজ করবে না, যেমনটি উন্নয়ন করতে চায় 'ক' সংস্থাটি।
এদিকে ৫০ লক্ষ টাকা 'ক' সংস্থাকে দিলেও ব্যয় দেখাতে হবে ১ কোটি টাকা। আবার এ টাকাটি না নিলে সংস্থাটি দাঁড়াতেও পারছে না এবং অনেক বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হবে না।
এমতাবস্থায় এই ১ কোটি টাকা উপরোক্ত শর্তে (৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে দেয়ার শর্তে) নেয়া জায়েয হবে কি?
উত্তর : সাধারণ অবস্থায় ঘুষ দেয়া নেয়া উভয়টি হারাম ও কবীরা গুনাহ। তাই ঘুষের কারবার থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আর কঠিন প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে ঘুষ দেয়ার অবকাশ থাকলেও তা নেয়ার অনুমতি কোনভাবেই নেই। আর প্রশ্নোক্ত শর্তটি ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ঘুষ দিয়ে সমাজসেবা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সুতরাং ঘুষ দেয়ার শর্তে অনুদান গ্রহণ করা 'ক' সংস্থার জন্য জায়েয হবে না। হ্যাঁ ব্যবস্থাকারীর যদি এ অনুদান মঞ্জুর করতে গিয়ে যাতায়াত খরচ ও আনুসঙ্গিক কোন খরচ হয়ে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র খরচ পরিমাণ টাকা তাকে দেয়া যাবে।
(সূরা বাকারা- ১৮৮, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৩৯০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৩৩৬, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর ১/২৬৭, ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ ৫/৪৭৪, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৬/৪১৭৮, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ২২/২২২, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৩৪২)

মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন
মেহনাজ মোবাইল পয়েন্ট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

১৫৭ প্রশ্ন : (ক) বর্তমান সময়ে আমদানীকারকগণ বিদেশ থেকে এল.সি-এর মাধ্যমে মালামাল আমদানী করে থাকেন। আর এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, রফতানীকারকের পাঠানো মালামাল আমদানীকারকের হস্তগত হওয়ার আগেই আমদানীকারক তা অপর আরেকজনের নিকট বিক্রয় করে দেয়। তো মালামাল আমদানীকারকের হস্তগত হওয়ার আগেই এভাবে বিক্রি করার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান কি?
(খ) ক্রয়কৃত মালামাল আমদানীকারকের হস্তগত হওয়ার আগে মাঝ পথে ধ্বংস হয়ে গেলে তার দায়ভার কার উপর বর্তাবে? আমদানীকারকের উপর নাকি রফতানীকারকের উপর?
উত্তর : (ক) রপ্তানীকারক কর্তৃক মাল শিপমেন্টের পর শিপমেন্টের কাগজ-পত্র (তথা B.L) আমদানীকারকের হস্তগত হওয়ার পর আমদানীকারক কর্তৃক অপরের নিকট বিক্রি করা ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বৈধ। কারণ, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনের রীতি অনুযায়ী যখনই রফতানীকারক কর্তৃক ব্যবসায়িক পণ্য শিপিং কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করা হয়, তখনই শিপিং কোম্পানী Bill of Lading (বিল অফ লেডিং) তৈরী করে রফতানীকারকের সম্পৃক্ত ব্যাংকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর এই ব্যাংক অন্যান্য কাগজ-পত্রসহ Bill of Lading-কে আমদানীকারকের এল.সি (Letter of Credit) কৃত ব্যাংকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। এরপর শিপিং কোম্পানী যখনই ব্যবসায়িক পণ্য আমদানীকারকের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়, তখন থেকেই ঐ পণ্যের যাবতীয় রিস্ক আমদানীকারকের উপর এসে অর্পিত হয়। সুতরাং যখন পণ্যের রিস্ক আমদানীকারকের উপর এসে অর্পিত হল (যা কেবল পণ্য হস্তগত হলেই হয়ে থাকে) তখন বাহ্যিকভাবে হস্তগত না হলেও ঐ পণ্য আমদানীকারক অপরের নিকট বিক্রি করতে পারবে। তবে ঐ পণ্য দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত এর দায়ভার আমদানীকারকের উপরই থাকবে।
উল্লেখ্য, বাহ্যিকভাবে আমদানীকারকের হস্তগত হওয়ার পূর্বে মাত্র একবারই ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হবে। একের অধিক ক্রয়-বিক্রয় যা বর্তমানে হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।
(আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩২/২৫৭, বাদায়িউস সানায়ে ৬/৫৭১, ৭/২৩৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/১৯, ফিকহুল বুয়ূ' ২/১০৯১, ১০৯৮, ফিকহী মাকালাত ৩/৭৭, জাদীদ মাসাইল; পৃষ্ঠা ৩০৬)
(খ) ক্রয়কৃত মাল আমদানীকারকের হস্তগত হওয়ার পূর্বে মাঝ পথে তা ধ্বংস হয়ে গেলে, তার দায়ভার আমদানীকারকের উপরই বর্তাবে। কারণ, রপ্তানী কারক কর্তৃক মালামাল শিপমেন্ট করার পরই তা আমদানীকারকের রিস্কে এসে যায়।

কাজেই যদি মাঝ পথে মালামাল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার দায়ভার আমদানীকারকের উপরই বর্তাবে।
(ফাতাওয়া কাযীখান ২/২৫৬, বাদায়িউস সানায়ে ৭/২৩৭, জাদীদ তিজারাতী শিক্লেঁ; পৃষ্ঠা ৬৪, জাদীদ মাসাইল; পৃষ্ঠা ৩০৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/১৩৪)

মু'আশারাত

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
মিরপুর, ঢাকা

১৫৮ প্রশ্ন: বর্তমান রাষ্ট্রীয় আইনে বিবাহের সময় স্ত্রীকে تفويض তথা তালাক গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়াকে আবশ্যক করা হয়েছে। আর স্ত্রীরা যাতে প্রয়োজনের সময় কোর্টে গিয়ে تفويض গ্রহণ করতে পারে সে নিমিত্তেই ১৮নং ধারার ঘরটি রাখা হয়েছে। সরকারের এ বাধ্যবাধকতা ন্যূনতম এক তালাকে বাইনের ক্ষেত্রে জনহিতকর একথা অনস্বীকার্য। সাথে সাথে ১৮নং ধারায় কাজিদের সম্মতি দিয়ে দেয়াটা সাধারণ প্রচলিত নিয়মে পরিণত হয়েছে, যা শরীয়তের সাথেও সাংঘর্ষিক নয়। এ প্রেক্ষাপটে তালাকের স্বাভাবিক নিয়মাবলীর মাঝে আর কাবিননামা ও তালাকনামার স্বাভাবিক নিয়মের মাঝে তফাৎ হবে কি না তা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা কতক আলেম নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর শরয়ী সমাধান কামনা করছি।

(ক) কাবিননামায় কাজির নিম্নোক্ত تصرف গুলোর হুকুম জানতে চাই-

(১) স্বামীর দস্তখত নেয়ার সময় সাদা কাগজে / কাবিননামার ১৮নং ধারায় কিছু না লিখে থাকলে।

(২) স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাজি নিজের পক্ষ হতে তালাকের সম্মতি লিখে দিলে।

(৩) নিষেধ করা সত্ত্বেও সম্মতি লিখে দিলে।

(খ) স্বামী যদি দাবি করে যে, আমি সম্মতি দেইনি, বরং কাজি সাহেব আমার অগোচরে সম্মতি লিখেছে বা আমার সামনেই জোরপূর্বক আইনের ভয় দেখিয়ে লিখে নিয়েছে, এক্ষেত্রে কি تفويض হয়েছে ধরা হবে? নাকি স্বামীর কথার সাক্ষী তালাশ করে সেটাই গ্রহণ করা হবে?

(গ) স্বামী সংখ্যা উল্লেখ ছাড়া তালাকে تفويض দিলে কত তালাক হবে? পরবর্তীতে স্ত্রী তিন তালাক গ্রহণ করলে তালাক হবে কি না? হলে কত তালাক হবে?

(ঘ) তালাকনামার উদ্দেশ্যই যেহেতু স্বামী থেকে বিচ্ছেদ হওয়া তাই এক্ষেত্রে রজঈ শব্দগুলোকে কি বাইনের উপরই প্রয়োগ করা হবে? নাকি তালাকনামার দ্বারা রজঈ তালাক হওয়ার কোন সূরত আছে?

অনুগ্রহ করে বিষয়গুলোর সমাধান দিলে উপকৃত হবো। কেননা আমরা প্রতিনিয়তই এসব মাসআলার সম্মুখীন হচ্ছি।

উত্তর : আমাদের দেশে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের যে সরকারী নিয়ম চালু আছে, বিয়ে সংঘটিত হওয়ার জন্য তা জরুরী নয়। কিন্তু যেহেতু তা বিবাহের লিখিত রূপ এবং স্বীকৃত প্রমাণ তাই তাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষের কিছু নেই, বরং প্রশংসনীয়।

উল্লেখ্য, প্রায় সব এলাকায়ই দেখা যায়, বর-কনের ঈজাব-কবুলের পূর্বেই কাবিননামা পূরণ করা হয় এবং বর তাতে স্বাক্ষর করে দেয়। এতে স্ত্রী কখনো তালাক গ্রহণের অধিকারী হয় না। (ফাতাওয়া শামী ৩/২৪২, আল-বাহরুর রায়িক ৩/৫৫২)

আর সরকারী নিয়মও হল বিবাহের পর তা পূরণ করা। সুতরাং রেজিস্ট্রেশন করতে হলে বিবাহের পরেই করবে।

(ক) (১) সাদা কাগজে বা ১৮নং ধারায় কিছু না লেখা হলে তথা বাস্তবেই যদি ১৮নং ধারাটি খালি থেকে যায় আর বর তাতে স্বাক্ষর করে দেয়, তাহলে তাফবীয বা তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান হবে না। তবে সাধারণত কাজিরা নিজ থেকেই হ্যাঁ লিখে দেয়।

(২), (৩) **(খ)** বিনা অনুমতিতে কাজি নিজ থেকে তালাকের সম্মতি লিখে দিল বা নিষেধ করা সত্ত্বেও সম্মতি লিখে দিল এবং বর তা জানার পরও স্বাক্ষর করে দিল তাহলে এতে তাফবীয হয়ে যাবে।

আর যদি কাজি এই বলে স্বাক্ষর গ্রহণ করে যে, আমি পরবর্তীতে পূরণ করে নিবো, অথবা বর এ বিষয়টি জানে যে, পরবর্তীতে কাজি তার অগোচরে সম্মতি লিখে নিবে তা সত্ত্বেও সে তার অসম্মতির কথা না জানিয়ে বা 'তাফবীযের অধিকার দেয়া হল না' একথা না বলে স্বাক্ষর করে দেয় তাহলে তাফবীয হয়ে যাবে।

আর আইনের ভয় দেখিয়ে লিখে নিয়ে স্বাক্ষর গ্রহণ করলেও তাফবীয হয়ে যাবে। তবে স্বাক্ষর না করলে কোন সূরতেই তাফবীয হবে না। (আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন; হা.নং ৪৪৬৫, ফাতাওয়া কাযীখান ১/২৩, ফাতাওয়া শামী ৩/১৯০, ২৩০, ২৩৫, ৩২৬, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৩/৬৫)

(গ) স্বামী সংখ্যা উল্লেখ করা ব্যতীত এবং তিন তালাকের নিয়ত ব্যতীত তালাকে তাফবীয দিলে অতঃপর পরবর্তীতে স্ত্রী তালাক গ্রহণ করলে, এক তালাকে বাইন হবে। আর তিন তালাক গ্রহণ করলেও এক তালাকে বাইন হবে। আর স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে থাকলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী তিন তালাকও গ্রহণ করতে পারবে। (ফাতাওয়া শামী ৩/৩২৫, বাদায়িউস সানায়ে ৪/৩১২, আল-বাহরুর রায়িক ৩/৫৫০)

(ঘ) হ্যাঁ, স্বামী স্ত্রীকে তাফবীয তথা তালাক গ্রহণের মালিক বানালে, স্ত্রী রজঈ শব্দ ব্যবহার করলেও তাকে বাইনের উপর প্রয়োগ করা হবে। তবে স্বামী যদি তাফবীযের সময় রজঈ শব্দ ব্যবহার করে এভাবে বলে যে, তোমাকে রজঈ তালাকের ক্ষমতা প্রদান করলাম তখন স্ত্রী তালাক গ্রহণ করলে রজঈ তালাকই পতিত হবে। (বাদায়িউস সানায়ে ৪/৩১২)

বিবিধ

মুহাম্মাদ আমীর হুসাইন
বি-বাড়িয়া

১৫৯ প্রশ্ন : (ক) আমার ফুফু আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নাভি দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন? কিন্তু জানা না থাকার কারণে উত্তর দিতে পারিনি। সঠিক কথাটি জানালে ভাল হয়।

(খ) আমার এক মামা ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিবাহ করেছে। প্রথমে সে এক মহিলাকে বিবাহ করেছে। তারপর সে মহিলা তার তালাক ব্যতীত চলে গেছে। এভাবে ৭টি বিবাহ করেছে। প্রথম ৬

জন তার তালাক দেয়া ছাড়াই চলে গেছে। বর্তমানে সে সপ্তম স্ত্রীর সাথে সংসার করছে। এখন জানার বিষয় হলো ৭ম স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বৈধ হয়েছে নাকি অবৈধ? যদি অবৈধ হয় তাহলে বৈধ করার কোন সূরত আছে কি?

(গ) আমাদের গ্রামের কিছু লোক মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর চারজন চারটি ডাল নিয়ে কবরের চার পাশে দাঁড়ায় এবং সকলে মিলে চার কুল পড়ে ডালগুলো চার কোণায় গেড়ে দেয়। তাদের এ কাজগুলো সঠিক আছে কিনা?

উত্তর : (ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃনাভি দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন মর্মে কথাটি ভিত্তিহীন। বরং নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে তিনি অন্য সকলের ন্যায় স্বাভাবিকভাবেই জন্মগ্রহণ করেছেন।

(মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭১৫১, ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ ১/৪৮, আর-রহীকুল মাখতুম; পৃষ্ঠা ৬২, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ ১/৭৯,

(খ) ইসলামী শরীয়তে একজন পুরুষের জন্য একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৪ জন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে। প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে পরবর্তী ৩টি বিবাহ বৈধ হয়নি। তাই ৭ম বিবাহটিও বৈধ হয়নি। এখন ৭ম স্ত্রীর সাথে বিবাহ বৈধ করতে হলে প্রথম চার জনের কোন একজনকে তালাক দিতে হবে এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হলে ৭ম স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে হবে।

(সূরা নিসা- ৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৭, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৮, ৪/৩৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩০৫, আল-বাহরুর রায়িক ৩/১৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৭/৫০, ৪৩৯)

(গ) কবরে গাছের ডাল গাড়ার যে প্রথা আছে, তা মাকরূহ ও বিদ'আত। আর গাছের ডাল গাড়ার যে হাদীসটি আছে, তা মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই খাস। উম্মতের জন্য প্রযোজ্য এমন কোন প্রমাণ নেই।

(সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৮, ফাতহুল মুলহিম ২/৫০, ফাতহুল বারী ১/৫২৯, ইন'আমুল বারী ৪/৫৩৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৮/৪৯৬)

মাসউদুল হাসান, পাবনা
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

১৬০ প্রশ্ন : (ক) দাড়ির সীমানা কতটুকু? চেহারার কোন্ কোন্ অংশের পশম দাড়ির অন্তর্ভুক্ত?

(খ) গাল/চোয়ালের পশম কাটা যাবে কি না?

(গ) নিমদাড়ির হুকুম কি? কাটা যাবে কি না? কাটা গেলে কী পরিমাণ?

উত্তর : (ক ও খ) উভয় কানের মাঝ বরাবর উত্থিত হাড্ডি থেকে শুরু করে চোয়াল ও থুতনীতে যে পশম রয়েছে, সবই দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। এক মুষ্টির কম হলে তা ছাঁটা বা চেঁছে ফেলা হারাম ও মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

পক্ষান্তরে গাল, গলা ও উপরের মাঢ়ীর বরাবর চোয়ালের পশম দাড়ির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তা ছোট করা বা চেঁছে ফেলাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে চাঁছার ক্ষেত্রে এত বাড়াবাড়ি করবে না যে, চেহারা বিকৃত হয়ে যায় কিংবা দেখতে হিজড়ার মত লাগে।

(আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩৫/২২২, ফাতাওয়া শামী ১/১০০, সহীহ বুখারী ১৫/৯১)

(গ) নিমদাড়ি কাটা উচিত নয়। হ্যাঁ নিমদাড়ি লম্বা হওয়ার কারণে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় যেমন তা বেঁকে ঠোঁটের উপর এসে পড়ে যদ্দরুন খানা-পিনা ইত্যাদিতে সমস্যা হয় তাহলে প্রয়োজন মত ছোট করার অবকাশ রয়েছে।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪৩৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/২৫৭)

বশির আলী
লক্ষ্মীপুর

১৬১ প্রশ্ন : (ক) বর্তমানে দেখা যায়, বিভিন্ন স্থানে খতনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে অনেক লোককে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো এই অনুষ্ঠান বৈধ কি না?

(খ) হাঁচিদাতা যদি আল্হামদুলিল্লাহ বলে তাহলে শ্রোতাদের জন্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বা অন্য কোন দু'আ পড়া ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? কেউ কেউ বলেন ওয়াজিব, কেউ বলেন সুন্নাত। সঠিক কোনটি? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর (ক) খতনা উপলক্ষে বর্তমানে যে অনুষ্ঠান করা হয় তা শরীয়ত স্বীকৃত নয়, সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। হাদীসে এসেছে, একদা হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রাযি.-কে খতনা উপলক্ষে দাওয়াত করা হলে তিনি এ বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে,

إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له

অর্থ : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা খতনা উপলক্ষে সমবেত হতাম না এবং এজন্য আমাদেরকে ডাকা হত না। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭৯০৭)

তবে কেউ যদি স্বীয় সন্তানের খতনার ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ায় শুকরিয়া স্বরূপ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, সামাজিক চাপের মুখে না পড়ে, শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ (যেমন, আলোকসজ্জা, সপ্তম দিন নির্ধারণ করা, মেহমানগণকে উপঢৌকন আনতে বাধ্য করা ইত্যাদি) না করে লোকদেরকে দাওয়াত করে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

(মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭৯০৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৪২২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/১১৬, ফাতাওয়া উসমানী ১/১২০, ইমদাদুল মুফতীন ২/১৯৫)

(খ) হাঁচিদাতা যদি আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে শ্রোতাদের জন্য يرحمك الله বলা ওয়াজিব। তবে যদি বারবার হাঁচি দিতেই থাকে, তাহলে তিনবারের বেশি জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ১২৪০, আদবুল মুফরাদ ১/৩২৬, আল-ইসতিযকার ৮/৪৮৩, হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১/২৭২, ৪৯৫, মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/১৮১)

মাহবুবুল হাসান
মিরপুর, ঢাকা।

১৬২ প্রশ্ন : আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আমাদের ভর্তি হওয়ার পর প্রথম দেড় বছর Anatomy (ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা) পড়ানো হয়। এক্ষেত্রে আমাদের মানব দেহের হাড় বা কঙ্কাল কিনতে হয় এবং ব্যবহার শেষ হলে আমরা তা জুনিয়রদের কাছে বিক্রি করে দিই।

এক্ষেত্রে যে দামে কেনা হয়, তার থেকে সাধারণত পরবর্তীতে বেশি দামে বিক্রি করা হয়। আমি প্রথম বর্ষে থাকাকালীন একজনের সাথে ২০,০০০/- টাকা দিয়ে (দুই জনের প্রত্যেকে ১০,০০০/- টাকা করে) শেয়ারে কঙ্কাল ক্রয় করেছিলাম। এখন এর বিক্রয়মূল্য প্রায় ৩০,০০০/- থেকে ৩৫,০০০/- টাকা। প্রশ্ন হল,

(ক) এই হাড় বা কঙ্কাল মেডিকেল ছাত্রদের জন্য লাভে ক্রয়-বিক্রয় অথবা বিনা লাভে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি না?

(খ) যারা শেয়ারে ক্রয় করেছে, তাদের একজন যদি বিক্রয়ে ইচ্ছুক এবং অপরজন অনিচ্ছুক হয়, তাহলে কী করণীয়?

(গ) আমি যদি এটি বিক্রি না করে পড়াশোনার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু জুনিয়র ভাইদের দিয়ে যাই যাতে তাদের ক্রয়-বিক্রয় করতে না হয়, এই ব্যাপারে কী করণীয়?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমি আদম জাতিকে সম্মানিত করেছি'। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭) সুতরাং মানুষের কোন অঙ্গ বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। মানুষ মারা গেলে তার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হল, তাকে দাফন করে দেয়া। তার কোন অংশ দাফন না করে রেখে দেয়া, তা নিয়ে গবেষণা করা শরীয়তমতে জায়েয নেই। অতএব, মেডিকেল গবেষণার জন্য মানবকঙ্কাল ব্যবহার, তার ক্রয়-বিক্রয় ও দানপত্র কোনটাই জায়েয নেই। পরীক্ষা বা গবেষণার প্রয়োজনে কৃত্রিম কঙ্কাল ব্যবহার করতে হবে। যার ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ হবে।

অপরের চিকিৎসার স্বার্থে একজনের কঙ্কালের বে-হুরমতি করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা কাউকে প্রদান করেননি। কাজেই আপনারা বিলম্ব না করে এ মানব-কঙ্কালটি দাফনের ব্যবস্থা করুন। আর বিগত দিনে কঙ্কাল নিয়ে গবেষণার গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করুন।

(সূরা বনী ইসরাঈল- ৭, ফিকহুল বুয়ূ' ১/৩১৪, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩২০৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/৩১৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/৩২৮)

বিসমিহী তা'আলা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষা সমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত

'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র

বার্ষিক ফুযালা সম্মেলন ২০১৬

স্থান : জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া

২৩ শে এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. রোজ শনিবার | সকাল ৯টা হতে আসর পর্যন্ত

সম্মেলনে রাবেতার সকল সদস্যকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

- কেন্দ্রের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও রাবেতার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য ফুযালায়ে কেরামকে পার্শ্ববর্তী/পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- দূরবর্তী ফুযালায়ে কেরামকে সম্মেলনের আগের দিন চলে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামি'আর পক্ষে

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

মাওলানা হিফজুর রহমান
প্রিন্সিপ্যাল
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

রাবেতার পক্ষে

মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম আল মাসউদ
আমীর, মজলিসে শূরা
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

ইলমী উপকরণের আদব ও সম্মান

মুফতী হিদায়াতুল্লাহ

পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিস ইলম বা জ্ঞান। জ্ঞানের ভিত্তিতেই ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও জাতি উঁচু কিংবা নিচু, সম্মানিত বা অসম্মানিত হয়। এজন্যই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড মনে করে। কিন্তু জ্ঞানসমূহের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা সকল জ্ঞানের উৎস। যারা ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী তারাই আল্লাহর কাছে উভয় জগতে দামী ও মূল্যবান। কারণ ইসলামী জ্ঞান একমাত্র সে-ই অর্জন করতে পারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান।

যে কোন জ্ঞান লাভের জন্য কিছু আদব ও শিষ্টাচার রয়েছে। যেগুলো ছাড়া তা অর্জন করা যায় না। আর ইসলামী জ্ঞান বা ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আরো রয়েছে আরও বেশ কিছু আদব-কায়দা। উপরন্তু ইসলাম তো আদবেরই ধর্ম। তাই প্রত্যেক ইলমপিপাসুর জন্য ইলমী আদবের প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরী। অন্যথায় ইলম অর্জনের কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রমে পদস্খলনের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে নিয়ে সকল পূর্বসূরীই ইলম অর্জনে আদবের প্রতি অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। আল্লামা ইবনে সীরীন রহ. সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলেন,

كانوا يتعلمون الهوى كما يتعلمون العلم.

অর্থ : সাহাবায়ে কেরাম ঠিক তেমন গুরুত্ব দিয়ে আদব শিক্ষা করতেন যেমন শিক্ষা করতেন ইলমে দীন । (খুলাসাতু তা'যীমিল ইলম; পৃষ্ঠা ৩১)

হযরত মালেক ইবনে আনাস রাযি. একবার এক কুরাইশ যুবককে বলেন,

يا ابن اخى! تعلم الادب قبل ان نتعلم العلم.

ভাতিজা! তুমি ইলম শেখার পূর্বে আদব শেখো। (খুলাসাতু তা'যীমিল ইলম; পৃষ্ঠা ৩১)

তা'লীমুল মুতাআল্লিমীন গ্রন্থের এই উক্তি তো খুবই প্রসিদ্ধ ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة.

(অর্থ) 'যে যতটুকু মর্যাদা অর্জন করেছে তা আদবের কারণেই অর্জন করেছে। আর যে ব্যর্থ হয়েছে সে আদব বর্জন করার কারণেই ব্যর্থ হয়েছে।'

তাই ইলমের পথে ইলমের চেয়ে অধিক যত্নবান হতে হবে আদবের প্রতি। এখন ইলম অর্জনের কয়েকটি আদব নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হবে

দুধ কিংবা মেশক-আম্বর যতই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান হোক, পাত্র নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত হলে তা বিনষ্ট ও মূল্যহীন সাব্যস্ত হয়। তেমনি ইলমে দীন সর্বাধিক উপকারী হওয়া সত্ত্বেও তা উপযুক্ত পাত্রে ধারণ করা না হলে কল্যাণের আশা করা যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب.

অর্থ : অপাত্রে ইলম দান শুকরের গলায় মণি-মুক্তা ও স্বর্ণের মালা পরানোর মত। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২২৪)

ইলমের পাত্র হল খোদ তালিবে ইলম ও তার অন্তর। তালিবে ইলমের বাহ্যিক অবস্থা যদি রাসূলের সুন্নাত ও ইসলামী আদর্শ মোতাবেক না হয় এবং অন্তর গুনাহের নাপাকি থেকে পবিত্র না হয় তাহলে অর্জিত ইলম নষ্ট হয়ে যায়, এর দ্বারা উপকারের কোন আশা করা যায় না। বরং সে প্রকৃত ইলম ও ইলমের নূর থেকেই বঞ্চিত থাকে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর প্রসিদ্ধ উক্তিটি স্মরণ করুন।

شكوت إلى وكيع سوء حفظى × فاوصانى إلى ترك المعاصى.

فان العلم نور من الهى × ونور الله لا يعطى لعاصى.

অর্থ : আমি আমার উস্তাদ ওয়াকীর কাছে ভুলে যাওয়ার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ বর্জনের অসিয়ত করলেন। বললেন, নিশ্চয় ইলম খোদার নূর, আর খোদার নূর তার নাফরমানকে দেয়া হয় না।

তাই ইলম অর্জনের পূর্বে ইলমের পাত্র পূত-পবিত্র হওয়া জরুরী। তালিবে ইলমের ভেতর-বাহির রাসূলের আদর্শ ও সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক।

বিষয় নির্বাচন ও পড়ালেখার আদব

ইলমী ময়দানে সাফল্য অর্জনের অন্যতম আদব হল, যোগ্য, খোদাভীরু ও স্নেহশীল উস্তাদকে নিজের মুরব্বী নির্ধারণ করা। সকল কাজ তার সঙ্গে পরামর্শ করে করা। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে উস্তাদই তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও অধ্যয়নের বিষয় ঠিক করে দিবেন। কারণ উস্তাদ তার অভিজ্ঞতার আলোকে যা অনুধাবন করবেন একজন ছাত্র তা অনুধাবন করতে অপারগ ও অক্ষম। তা'লীমুল মুতাআল্লিমীন পুস্তকে বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ. ফিকহী ইলম চর্চার উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ.এর সান্নিধ্যে নামাযের অধ্যায় পড়া শুরু করেন। তখন উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ. তাকে বলেন,

اذهب وتعلم علم الحديث.

অর্থ : তুমি হাদীসের ইলম শিক্ষা কর।

উস্তাদ মুহাম্মাদ স্বীয় বিচক্ষণতার আলোকে ছাত্র মুহাম্মাদের জন্য ইলমে হাদীস চর্চাকে উপকারী মনে করেছেন। দেখা গেছে, ছাত্রটি উস্তাদের পরামর্শ মেনে ইলমে হাদীস অর্জনের মাধ্যমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হতে পেরেছেন। বর্তমানে এ ব্যাপারে আমরা সীমাহীন গাফলতে ডুবে আছি। পড়াশোনার বিষয় নিজের ইচ্ছামত নির্ধারণের ফলে বহু মেহনত সত্ত্বেও আমরা আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না।

উস্তাদের প্রতি আদব

ইলম অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলেন উস্তাদ। ইসলামের দৃষ্টিতে শাগরেদের জন্য উস্তাদ মুনিব ও পিতৃতুল্য। মুনিবতুল্য এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ.

অর্থ : স্মরণ কর, যখন মূসা তার ভৃত্যকে বলল...। (সূরা কাহাফ- ৬০)

বিজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, আয়াতে বর্ণিত فَتَاهُ শব্দটির একটি অর্থ হল, ভৃত্য-ক্রীতদাস। অথচ এখানে শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ইউশা ইবনে নূন, যিনি ছিলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ছাত্র; তার ক্রীতদাস নয়। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা ক্রীতদাস বলে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের মর্যাদা মুনিবতুল্য। হযরত

আলী রাযি.এর একটি উক্তিতে বিষয়টি এভাবেই উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেন,

انا عبد من علمني حرفا واحدا ان شاء باع
وان شاء اعتق وان شاء استرق.

অর্থ : আমি সেই ব্যক্তির গোলাম, যিনি আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দিয়েছেন। ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে বিক্রিও করতে পারেন, আযাদও করতে পারেন, আবার ক্রীতদাসরূপেও রেখে দিতে পারেন। (তা'লীমুল মুতাআল্লিমীন)

যদিও বাস্তবে ক্রীতদাস হয়ে যাওয়া এ উক্তির মর্মার্থ নয়। উদ্দেশ্য হল উস্তাদের বাস্তব সম্মান নির্ণয় করা।

শিক্ষক পিতৃতুল্য

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

انما انا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم.

অর্থ : নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। কারণ, আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৭)

এজন্যই বলা হয়, উস্তাদ হলেন রূহানী পিতা। জন্মদাতা পিতার মতই জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে ছাত্রের উপর তার অনেক অধিকার রয়েছে। উস্তাদকে শ্রদ্ধা করা, তার সঙ্গে বিনয়ের সাথে কথা বলা, সাধ্যানুযায়ী তার খিদমত করা ছাত্রের কর্তব্য। অনুমতি ছাড়া তার সামনে না হাঁটা, উচ্চস্বরে কথা না বলা, অহেতুক প্রশ্ন না করা, হেলান দিয়ে না বসা ইত্যাদি আদবের অন্তর্ভুক্ত। এককথায় বৈধ সকল ক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা এবং অসন্তুষ্টি বর্জনে সচেষ্ট হওয়া ছাত্রের দায়িত্ব। উস্তাদের মৃত্যুর পরেও তার জন্য দু'আ করা, তার নিকটাত্মীয় ও সমসাময়িকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আদবের শামিল। উস্তাদের খিদমত বিষয়ে বাদশাহ হারূনুর রশীদের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটি এই-

একবার খলীফা হারূনুর রশীদ তার পুত্রকে ইলম ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লামা আসমায়ী রহ. এর কাছে প্রেরণ করেন। একদিন বাদশাহ দেখলেন, উস্তাদজী উযূ করছেন, তার পুত্র উস্তাদের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর উস্তাদ নিজ হাতে পা ধুচ্ছেন। খলীফা নারাজ হয়ে আল্লামা আসমায়ী রহ.কে বললেন, 'আমি সন্তানকে আপনার কাছে পাঠিয়েছি ইলম ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য। আপনি কেন তাকে নির্দেশ দিলেন না, এক হাতে পানি ঢালতে আর অপর হাতে আপনার পা ধুয়ে দিতে?! (তা'লীমুল মুতাআল্লিমীন; পৃষ্ঠা ৩৮)

উস্তাদের সংশ্লিষ্টদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

উস্তাদের সম্মানের কারণে তার সন্তান ও তার সঙ্গে সম্পৃক্তদেরও সম্মান করা জরুরী। হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী বুখারার এক উস্তাদের ঘটনা লিখেছেন,

উস্তাদ দরসে পড়াচ্ছিলেন আর কিছুক্ষণ পরপর আসন ছেড়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। তার এরূপ ওঠা-বসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার উস্তাদের পুত্রটি গলির ভেতর বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছে। খেলতে খেলতে কখনও সে মসজিদের দরজার কাছে চলে আসছে। উস্তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু তাকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। (প্রাগুক্ত)

এ থেকেই অনুমান করা যায়, পূর্বসূরীরা উস্তাদের প্রতি কী পরিমাণ সম্মান প্রদর্শন করতেন।

কোন কারণে উস্তাদ অসন্তুষ্ট হলে

উস্তাদ কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে বা তার মেজায-পরিপন্থী কোন কথা বলে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ত্রুটির জন্য ওযরখাহী করা এবং উস্তাদকে সন্তুষ্ট করা জরুরী। ছাত্রের কোন অসঙ্গত প্রশ্ন বা আচরণের কারণে উস্তাদ রাগ করলে, বকা দিলে বা প্রহার করলেও ছাত্রের কর্তব্য সেটা সহ্য করা। মন খারাপ করা বা তার নিন্দা করা অনুচিত। দারুল উলূম দেওবন্দের সুদীর্ঘকালের মুহতামিম কারী তৈয়ব রহ. বলেন, 'কেউ যদি কোন পীর সাহেবের কাছে বাইয়াত হয়, অতঃপর পীর সাহেবের কোন কাজ সুন্নাত পরিপন্থী দেখতে পায়, ফলে সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী কোন পীর সাহেবের হাতে বাইয়াত হতে চায়, তাহলে আল্লাহওয়ালাগণ সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে, সুন্নাতের খেলাফ আমলকারীর বাইয়াত বর্জন করাই উত্তম। কিন্তু সাবধান! ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বেয়াদবীমূলক কোন আচরণ-উচ্চারণ তার সঙ্গে করা যাবে না। অর্থাৎ তার কাছ থেকে বেয়াদবী করে ফিরে আসবে এটা বৈধ নয়। অন্যথায় এই বেয়াদবীই হবে তার আধ্যাত্মিকতার পথে সবচেয়ে বড় অন্যায়।' ঠিক তেমনি– আল্লাহ না করুন– যদি কোন উস্তাদ থেকে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কিছু প্রকাশ পায় তাহলে আদবের সাথে তার থেকে সরে যেতে হবে; বেয়াদবীর সাথে নয়। (কারী তৈয়ব রহ. এর ঐতিহাসিক ভাষণ)

কিতাব-পত্র, বই-পুস্তক ও খাতা-কলমের প্রতি আদব

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

অর্থ : কেবল পবিত্রগণই যেন তা স্পর্শ করে। (সূরা ওয়াকি'আ- ৭৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا يمس القران إلا الطاهر.

অর্থ : কেবল পবিত্র ব্যক্তিগণই কুরআন স্পর্শ করবে । (মুআত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ৬৮০)

অতএব যে জ্ঞান কুরআনী জ্ঞানের বিশ্লেষণ বা যে জ্ঞান কুরআনী জ্ঞান অর্জনে সহায়ক নিঃসন্দেহে সে জ্ঞানও সম্মানীয় হবে। এক্ষেত্রে পবিত্রতার নির্দেশ না থাকলেও তা যে অতি আদবের বিষয় এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। এজন্যই সালাফে সালিহীন উযূ ছাড়া ইলমী কিতাব ও বই-খাতা স্পর্শ করতেন না। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রহ. বলেন, 'আমি পবিত্রতা ব্যতীত কখনো কোন কাগজ স্পর্শ করিনি।' ইমাম সারাখসী রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি গভীর রাত পর্যন্ত ইলম চর্চা করতেন। পেটের পীড়ার কারণে এক রাতে তিনি সতের বার উযূ করেছিলেন। (তা'লীমুল মুতাআল্লিমীন; পৃষ্ঠা ৩৯)

ইমাম বুখারী রহ. তো শুধু উযূ করেই ক্ষান্ত হতেন না; গোসল করে প্রতিটি হাদীস লিখতেন। কারণ, ইলম যেমন নূর, উযূ-গোসল তথা পবিত্রতাও নূর। সুতরাং উভয় নূর একত্রিত হলে ইলমের নূর তো বেড়েই যাবে।

কিতাব-পত্র ও বই-খাতার আরও কতিপয় আদব:

কিতাব-পত্র ও বই-খাতার প্রতি পা সম্প্রসারিত করে না বসা। টেবিল, রেহাল ইত্যাদি উঁচু জিনিসের উপর রাখা। ধীরস্থিরভাবে রাখা, ছুড়ে ফেলা বা এলোমেলো করে না রাখা। পুস্তক বড় হলে দুই হাতে ধরা, এক হাতে উত্তোলন করে বাঁধাই নষ্ট না করা। বই-পুস্তককে বালিশ না বানানো, তার উপর ভর দিয়ে না ঘুমানো। বিভিন্ন ধরনের কিতাব-পুস্তক একটির উপর আরেকটি রাখতে হলে সবার উপরে কুরআনে কারীম রাখা, তার নিচে তাফসীর গ্রন্থ, তার নিচে হাদীস ও অন্যান্য গ্রন্থ রাখা। কোন

পুস্তকের প্রান্তটীকা উল্টোভাবে লেখা থাকলে সেটা পড়ার জন্য কিতাব না ঘুরিয়ে নিজে ঘুরে বসা। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এভাবেই কিতাব পড়তেন এবং সম্ভবত এ কারণেই তিনি ইলমের জাহায হতে পেরেছিলেন।
কাগজ-পত্র যেখানে সেখানে না ফেলা। পথে-ঘাটে পতিত কাগজ সম্ভব হলে হিফাযত করা, নিদেনপক্ষে পায়ে না মাড়ানো। ব্যবহৃত বা ব্যবহার-অযোগ্য কাগজ ফেলার জন্য আলাদা ঝুড়ি ব্যবহার করা, ময়লার ঝুড়িতে না ফেলা। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি বিসমিল্লাহ লেখা একটি চিরকুট অপবিত্র স্থানে দেখতে পেয়ে সেটিকে উঠিয়ে ধৌত করেন এবং সম্মান করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে ইলম অর্জনের তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেন। তারপরই শুরু হয় হযরতের পানিপথের ইলমী সফর। হযরত হাফেজ্জী রহ. এর সুযোগ্য শাগরেদ, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ রহ.কে তো হজ্জের সফরেও পথেপড়া কাগজ কুড়িয়ে হিফাযত করতে দেখা গেছে। অপ্রয়োজনীয় বই-পত্র ও ইলমী কিতাব মাটিতে দাফন করে, পানিতে ডুবিয়ে, এমনকি আগুনে জ্বালিয়েও হিফাযত করা যায়; এটাও আদবের অন্তর্ভুক্ত।
কলম, কালি, পড়ার টেবিল, কিতাবের তাক ও বুকশেলফের সম্মান করাও জরুরী। এগুলোও ইলম অর্জনের মাধ্যম। উপরন্তু সূরা কলামে আল্লাহ তা'আলা কলমের কসম করে তার সম্মান প্রদর্শন করেছেন। হযরত হাসান বসরী রহ. লেখার কালিকে শহীদের রক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তাই কালি নিঃশেষ হওয়া কলমকেও সম্মানের সাথে কোথাও দাফন করা কর্তব্য; যত্রতত্র ফেলে দেয়া উচিত নয়।

সহপাঠীদের আদব

ইলমী সফরের সঙ্গী ও সহপাঠীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরী। তবে কারো সঙ্গে মাত্রাহীন বন্ধুত্ব না করা যা ইলমের পথে প্রতিবন্ধক হয়। আবার কারো সঙ্গে বৈরী মনোভাবও না রাখা যা ইলমী উপকার অর্জনে পরস্পরের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। বরং সাথীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সুসম্পর্ক বজায় রাখাই আদব। শরীয়তে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তোষামোদ ঘৃণ্য কাজ। তবে ইলমী উপকার লাভের জন্য উস্তাদ ও সহপাঠীকে তোষামোদ করা বৈধ। সাথীদের মধ্যে নিজে দুর্বল হলে সবলদের সঙ্গে ভালো আচরণের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা। আর নিজে সবল হলে জ্ঞানকে নিজের অর্জন না ভেবে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করা এবং দুর্বলদের সাহায্য করা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে কখনো বিরক্তিবোধ না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه.

অর্থ : আল্লাহ সেই বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ পর্যন্ত লেগে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে লেগে থাকে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং)
পড়াশোনায় অমনোযোগী, দুনিয়ামুখী ও গুনাহে জড়িত সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

المرء على دين خليله فلينظر احدكم إلى من يخالل.

অর্থ : মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব-ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ভেবে-চিন্তে বন্ধু নির্বাচন করে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩৭৮)

প্রতিপক্ষের সঙ্গে হযরত থানবী রহ. এর আদব

দারুল উলূম দেওবন্দের বহু বছরের মুহতামিম মাওলানা কারী তৈয়ব সাহেব রহ. বলেন, 'আমি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.কে মরহুম আহমদ রেজা খানের অনেক মাসআলা ও মতামত নিয়ে দ্বিমত ও বিরোধিতা করতে দেখেছি। যেমনঃ কিয়াম করা, মীলাদ পড়া, উরস করা ইত্যাদি। কিন্তু তার নাম উচ্চারণকালে তিনি বলতেন, 'মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব'। একবার মজলিসে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি মাওলানা উপাধি ছাড়াই শুধু 'আহমদ রেজা খান' বলেছিলেন। এতে তিনি লোকটিকে খুব ধমকালেন এবং রাগ হয়ে বললেন, 'তিনি তো একজন আলেম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার ভিন্নমত রয়েছে এবং আমরা মনে করি, সেক্ষেত্রে তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর রয়েছেন। তাই বলে তাকে অপমান করা এবং তার সঙ্গে বেয়াদবীমূলক আচরণ করার কী উদ্দেশ্য? তোমরা তো তার পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন করছো! এটা জায়েয হল কীভাবে? দেখুন, হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. কোন আলেমের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে শুধু 'মাওলানা' শব্দটি বর্জন করার কারণে এতটা কঠোরতা করেছেন। অথচ প্রতিপক্ষ সেই আলেম হযরত থানবীর সঙ্গে চরম বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ করতেন। কিন্তু হযরত থানবী রহ. ছিলেন প্রকৃত ইলমের ধারক-বাহক। এজন্য ঘোর বিরোধীর প্রতিও আদব রক্ষায় তিনি ছিলেন সদা যত্নবান। (কারী তৈয়ব রহ. এর ঐতিহাসিক ভাষণ; পৃষ্ঠা ২৬)

বেয়াদব ইলমের নূর থেকে বঞ্চিত

কারী তৈয়ব সাহেব রহ. বলেন, পড়ালেখা শেষ করে ফারেগ হয়েছে এমন অনেক তালিবুল ইলম সম্পর্কে আমাদের জানা আছে, যারা দারুল উলূম দেওবন্দেই ইলম আহরণ করেছে, তাদের ভালো যোগ্যতাও আছে। কিন্তু উস্তাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বেয়াদবীমূলক। ফলে তারা ইলমের খিদমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেউ দোকানদারী করছে, কেউ গাড়ি চালাচ্ছে। মুহাদ্দিস, মুফাসসির হয়ে দীনের খিদমতে নিয়োজিত হওয়ার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। আর এমন অনেক তালিবুল ইলমকেও আমাদের আছে, যাদের যোগ্যতা ও জ্ঞানের পরিধি ছিল সীমিত ও সঙ্কীর্ণ। কিন্তু উস্তাদের প্রতি আদব ও খিদমত ছিল অতুলনীয়। দিন-রাত তারা আদবের সাথে উস্তাদের খিদমত করেছে। আমরা দেখছি, এখন তারা এত বড় বড় দীনী খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন, অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণও তা করতে পারছে না। কারণ, আদবের দ্বারা তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এমন গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা যোগ্যদের মধ্যে নেই।
মোটকথা, দীনের ভিত্তিই হলো আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের উপর। আদব ও সম্মান শরীয়তের একটি মৌলিক বিষয়। যেখানে শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ রয়েছে সেখানে সে সংশ্লিষ্ট কিছু আদবও রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি আদব-কায়দা মেনে চলতে না পারে, সে আসল বিধি-নিষেধ মানতেও অক্ষম ও অপারগ হবে। (প্রাগুক্ত)
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইলম অর্জনের সকল আদব মেনে চলার তাওফীক দান করেন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ মুহাম্মাদিয়া কড়াইল, টি অ্যান্ড টি কলোনী, বনানী, ঢাকা

কিশোর প্রতিভা

পিতৃসম মুরব্বীদ্বয়

উস্তাদগণ ছাত্রদের রূহানী পিতা। প্রবাদতুল্য কথাটি অনেক আগেই শুনেছি। তবে উপলব্ধি করেছি রাহমানিয়ায় আসার পর।

এক. ঈদুল আযহার দু'দিন আগে। কুরবানীর কাজ বিষয়ক সর্বশেষ হেদায়াতী জলসা। আসাতিযায়ে কেরাম আমাদেরকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করছিলেন। মুফতী সাহেব হুযূরের কাছে একটি চিরকুট পাঠানো হল। কতিপয় তালিবে ইলমের আব্দার– হুযূর! ঈদের দিন সকালে মাছের পরিবর্তে আমরা দেশী মুরগি খেতে চাই! চিরকুটখানা পড়ে হুযূর মুচকি হাসলেন। মজাক করে বললেন, আমি সচরাচর মুরগি খাই না; খেলে দেশী মোরগ খাই। এখন বলো, তোমরা কী খেতে চাও? মুরগি, না মোরগ?। সকলে সমস্বরে মোরগের পক্ষে আওয়াজ তুলল। হুযূর বললেন, আচ্ছা, ব্যবস্থা করা হবে ইনশাআল্লাহ। শুনে আমার দু'চোখে পানি চলে এল। না, মোরগ বা মুরগি ভোজনের পূর্ব-আনন্দে নয়; হুযূর আমাদের আব্দারকে একজন পিতার মন নিয়ে উপলব্ধি করেছেন এই কৃতজ্ঞতায়। হুযূরের চেহারায় তখন সত্যি সত্যিই আমরা পিতার ছায়া অবলোকন করেছিলাম।

দুই. প্রতি মঙ্গলবার বাদ আসর হযরত মুহতামিম ছাহেব (মুমিনপুরী) হুযূর দা.বা.এর মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এ মজলিসে তিনি তার শাইখ হারদুয়ী রহ.এর মালফূয পড়ে পড়ে তালিবে ইলমদের নসীহত করেন। তেমনি এক মজলিসে সালাম বিনিময়ের পর হুযূর ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা এখন মসজিদুল আবরারে বসে আছো। পাশেই জামি'আতুল আবরারের নির্মাণ কাজ চলছে। যে মহান মনীষী শাহ আবরারুল হক রহ.এর নামে এই মসজিদ-মাদরাসা, তোমাদেরকে ইলম, আমল ও কর্মের ময়দানে তাঁর মত আবরার (নেককার) হতে হবে। তাহলেই কেবল এই নামকরণ স্বার্থক হবে। এরপর একজন পিতা যেমন তার সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া-পড়াশোনাসহ যাবতীয় বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন, প্রিয় মুমিনপুরী হুযূরও আমাদের থাকা-খাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে খবরাখবর নিলেন। কোন ব্যাপারে অসুবিধা মনে করলে তা-ও তাকে জানাতে বললেন। এমন রূহানী পিতার আজকাল বড় অভাব। হে আল্লাহ! এই মুরব্বীদ্বয়সহ আমাদের জিসমানী, রূহানী সকল পিতাকে সিহ্হাত ও আফিয়াতের যিন্দেগী নসীব করুন। তাঁদের ছায়াকে আমাদের উপর আরও দীর্ঘ করে দিন। আ-মীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মাহফূজ ইবনে খানজাহান আলী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

অমলিন ভাস্কর্য

ভারতের উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত রায়বেরেলীর এক নিবিড় পল্লীতে তার জন্ম। এসেছিলেন অচেনা হয়ে। ফিরেছেন লাখো মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করে। তিনি ছিলেন হেদায়াতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। ইসলাম ও উম্মাহর জন্য ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। মুসলিম জনপদগুলো দু'চোখ ভরে দেখতে ছুটে বেড়িয়েছেন বিশ্ব-জাহান। উম্মাহর সমস্যা ও দুর্দশা, অনাচার ও অধঃপতন তার হৃদয়ে ব্যথা-বেদনার ঝড় তুলে দিয়েছিল। সেই মর্মবেদনা ও মনোকষ্টের ফসল ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين নামক কালজয়ী গ্রন্থ। কী করেননি তিনি এই 'রাখওয়ালহীন' উম্মাহর জন্য। উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আশায় গড়ে তুলেছেন 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'। চেতনার সন্দেশ বিলিয়েছেন 'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি'তে। 'ইসলামী সভ্যতা গবেষণা কেন্দ্র জর্দান' তাকে সদস্য পেয়ে হয়েছে ধন্য। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার'। ভ্রান্ত সাহিত্যের কালোবাজারে উড়িয়েছেন ইসলামের বিজয়-কেতন। 'রাবেতায়ে আদাবে ইসলাম আল-আলামিয়্যাহ' তার অমর কীর্তি। আরো কতো কতো কীর্তিগাথা তার, যার সামনে আকাশের চাঁদ-সেতারাও ম্লান। তিনি আর কেউ নন– উম্মাহর গৌরব, বিশ্বের সম্পদ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.।

মুহাম্মাদ জুনাইদ হুসাইন
জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর, ঢাকা

পাখির মা

পড়ন্ত বিকেলে ধানকাটা মাঠে বন্ধুরা খেলছিল। আমার খেলতে ভাল লাগছিল না। বসে বসে ওদের খেলা দেখছিলাম। এতদিন চোখে পড়েনি, এইমাত্র দেখলাম, মাঠের পাশে যে মেহেগনি গাছটা তার ডালে একটা পাখির বাসা। ছোট্ট বাসাটিতে লেজ-মাথা বের করে একটা ঘুঘু বসে আছে। মাথার ভেতর দুষ্টুমিগুলো কিলবিলিয়ে উঠল। পাখিটাকে ধরার ফন্দি আঁটলাম। লম্বা একটা লাঠি যোগাড় করে মাথাটা ভালো করে চোখা করে নিলাম। তারপর গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম বাসার নিচে। পাখিটাকে সই করে নীচ থেকে দিলাম সজোরে খোঁচা। এত বড় খোঁচা খেয়েও পাখিটা উড়ে গেল না। এমনকি নড়াচড়াও করলও না। এক আঘাতেই মরে গেছে মনে করে আরও জোরে খোঁচাতে লাগলাম। তখনই আমাকে অবাক করে দিয়ে 'মরা' পাখিটি বাসা ছেড়ে উড়াল দিল। গিয়ে বসল পাশের একটা খড়ের গাদায় । পাখিটি ভীষণভাবে আহত। শরীরের এখান-সেখান থেকে উঠে গেছে লোম, ঝরছে রক্ত। শিকার হাতছাড়া হওয়ায় সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বাসাটার ওপর। আঘাতে আঘাতে ওটাকে উল্টে দিলাম। গড়িয়ে পড়ল একটা ডিম। পড়েই গেল ফেটে। বেরিয়ে এল আধফোটা এক কুশিছানা। কয়েকবার কেঁপে উঠেই ছানাটি নিথর হয়ে গেল। সূর্য ডুবে গেছে। ভেসে আসছে মাগরিবের আযান। তাকিয়ে দেখি, খড়ের গাদায় ঘুঘুটা এখনও চুপচাপ বসে আছে। কেমন সকাতর চাহনি। এতক্ষণে আমার হুশ হল। পাখিটা তাহলে ছানাটার মহব্বতেই এমন নির্মম অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে? অনাগত সন্তানকে বাঁচানোর আশায় ভুলে গেছে নিজের বিপদ? আবার পাখিটার দিকে তাকালাম। মনে হল সন্তানের খুনিকে সে মনেপ্রাণে অভিশাপ দিচ্ছে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় মনের পর্দায় ভেসে উঠল মায়ের মুখ। সে মুখে তীব্র ভর্সর্ৎনা, কঠিন তিরস্কার। অজানা আশঙ্কায় থরথর করে কেঁপে উঠলাম। কোনোমতে বাড়িতে ফিরে প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে আর কখনও কাউকে কষ্ট দেবো না।

মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম
জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া হাজারীবাগ, ঢাকা।

আমার ঘর পোড়েনি, পুড়তে পারে না!

'একীনে দরিয়া পার' বলে একটা প্রবাদ চালু আছে। শুধু দরিয়া পার হওয়াই নয়, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন একীনেরই এককেটা দরিয়া। ভাবুন তো, একীন কতটা মজবুত হলে কেউ বলতে পারে– আমার সামনে এখন জান্নাত জাহান্নাম উপস্থিত করা হলেও আমার ঈমানে উঠতি-ঘাটতি হবে না। কারণ না দেখেও

এগুলোর প্রতি আমার দেখার মতো ঈমান হাসিল আছে। একীনে পাকা হওয়ার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের ঈমানকে অপরাপর মানুষের জন্য মাপকাঠি বানিয়েছেন। পাহাড় টলে গেলেও তাদের ঈমান-একীন টলবার ছিল না। সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা রাযি. এর কথাই ধরুন– এক ব্যক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তাকে সংবাদ দিল, জনাব! জলদি আসুন, আপনার মহল্লায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। আগুনে ঘর-বাড়ি সব ভস্মীভূত হয়েছে। আপনার বাড়িটিও এতক্ষণে ছাই হয়ে গেছে। এতবড় দুঃসংবাদ শোনেও হযরত আবুদ্দারদার কোনো পেরেশানী নেই। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, না, আমার বাড়ি পোড়েনি। সংবাদদাতা আশ্চর্য বোধ করল। এ কেমন মানুষ, ঘড়-বাড়ি পুড়ে যাওয়ার খবর শোনেও নির্বিকার! আবার বলছে, তার বাড়ি নাকি পোড়েনি! তিনি আবার দেখে এসে বললেন, জনাব! আপনার বাড়িটি তো পুড়ে গেছে। আবুদ্দারদা বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমার বাড়ি পুড়েনি। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনাকে বলা হচ্ছে আপনার বাড়ি পুড়ে গেছে, আর আপনি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে অস্বীকার করছেন!? ইতোমধ্যে একব্যক্তি এসে সংবাদ দিল, আবুদ্দারদা! আপনার মহল্লায় আগুন লেগে বহু বাড়ি-ঘর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার বাড়ির কাছাকাছি এসেই আগুন নিভে গেছে। আপনার কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। হযরত আবুদ্দারদা বললেন, আমি জানতাম, আল্লাহ তাআলা তেমনটি করবেন না। উপস্থিত একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুদ্দারদা! আমি ভেবে পাচ্ছি না, আপনার কোন উক্তিটি বেশি বিস্ময়কর– 'না, আমার ঘর পোড়েনি,' এটা, নাকি 'আমি জানতাম, আল্লাহ তাআলা তেমনটি করবেন না'! বলুন তো কিসের ভিত্তিতে আপনি চোখে দেখা বিষয়কেও কসম করে অস্বীকার করতে পারলেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রভাতকালে এ কালিমাগুলো পড়বে–

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

তাকে সন্ধ্যা অবধি কোন বিপদাপদ স্পর্শ করবে না। অনুরূপ সন্ধ্যায় পড়লে তাকে প্রভাত অবধি কোন বিপদাপদ স্পর্শ করবে না। আসল কথা হল, আজ সকালে আমি এই কালিমাগুলো পাঠ করেছিলাম। আল্লাহু আকবার! সাহাবায়ে কেরামের এই একীনই তাদের সামনে গোটা পৃথিবীকে গোলাম বানিয়ে উপস্থিত করেছিল। আর একীন না থাকার দরুন আমরা সবার কাছে গোলাম ও করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে আছি।

মাহদী হাসান ইবনে রফিক
জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, হাজারীবাগ, ঢাকা।

ভাগ্যলিপি

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার পর আট দিনের বিরতি দেয়া হল। গাড়িতে বসে ভাবছিলাম, বিরতিটা কীভাবে কাজে লাগানো যায়। সিদ্ধান্ত নিলাম, আব্বা-আম্মার খিদমত করব। তাদের নামায ও জরুরী সূরা-কালাম শুদ্ধ করে দেবো। হাতের লেখা সুন্দরতর করার অনুশীলনে এবং আকাবিরদের জীবনী অধ্যয়নে কাটাবো। পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়গুলো ভালোই কাটছিল। আর মাত্র দু'দিন পর মাদরাসা খুলবে। শরীরটা কেমন উল্টোপাল্টা আচরণ করছে। ঠিক যেমন করেছিল পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়। শারীরিক অস্বস্তি একসময় অসুস্থতায় রূপ নিল। ডাক্তারের কাছে গেলাম। বললেন, কয়েকদিন পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল সারা বছর প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকব। এখনও পর্যন্ত কোন দরসে অনুপস্থিত থাকিনি। কিন্তু যথাসময় উপস্থিত হতে না পারলে তো...। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দ্রুত রোগমুক্তির দু'আ করছিলাম। আব্বা-আম্মাও দু'আ করছিলেন। আশায় ছিলাম, খোলার তারিখেই মাদরাসায় উপস্থিত হতে পারব। কিন্তু না, আমাকে সুযোগ দেয়া হল না। এক সপ্তাহ পরে কিছুটা সুস্থ হলাম। পড়াশোনায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেছি। খুব আফসোস হল। আসলে আল্লাহ তা'আলা হেকমতওয়ালা, মহাপ্রজ্ঞাময়। তার কোনও কাজ হেকমত ও প্রজ্ঞা বহির্ভূত নয়। তিনি তো বান্দার জন্য কল্যাণকর ফায়সালাই করে থাকেন। সবকিছু তারই তাকদীর ও নির্ধারণ অনুযায়ী ঘটে। কাজেই ভাগ্যলিপি খণ্ডাবে সাধ্য কার? এই অসুস্থতা ও অনুপস্থিতিই আমার ভাগ্যলিপি। আমি বিশ্বাস করি, আমার জন্য এতে অবশ্যই কোন কল্যাণ নিহিত আছে।

মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ
জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া হাজারীবাগ, ঢাকা।

শুভবুদ্ধির উদয় আর কবে?

তাকরার শেষে গোসল করতে গেলাম। সে-কি ঠাণ্ডা! একেবারে জমে যাওয়ার উপক্রম। দ্রুত গোসল সেরে গরম কাপড় পরলাম। ঠাণ্ডাটা এখনও কাবুতে আসেনি। এমন সময় উস্তাদজীর গুরুগম্ভীর আওয়াজ- 'সকলকে আছরের নামায দোতলায় পড়তে হবে।' আগে না হলেও এখন ঠিকই শরীরটা উত্তাপ ছড়াতে শুরু করল। কমবেশি সবাই শঙ্কিত। না জানি কোন্ বিচার-আচার শুরু হয়! কেউ একজন মিনমিন করে বলল, মাদরাসা তো নয় জেলখানা! আমার অবশ্য খুব কিছু মনে হচ্ছে না। শুধু ইয়াদ করার চেষ্টা করছি, গত এক সপ্তাহয় কোনো উল্টাসিধা হয়েছে কিনা। নাহ! তেমন কিছু মনে পড়ছে না। নামায শেষে সবাই জড়সড় হয়ে বসলাম। উস্তাদজী বড় আক্ষেপের সঙ্গে শুরু করলেন, 'যে উদ্দেশ্যে বসা, তা কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তোমরাই বানিয়ে নিয়েছো।' আশঙ্কা এবার আতঙ্কে রূপ নিল। আজ নিশ্চয় কারো কপালে খারাবি আছে! একটু বিরতি নিয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা খানা নষ্ট কর! রিযিকের নাশোকরী কর! অথচ রিযিক আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামত। যে কেউ রিযিকের নাশোকরী করবে, তার যথাযথ কদর করবে না– জেনে রেখো, যিন্দেগীর কোন একসময় তাকে অবশ্যই রিযিকের কষ্ট পোহাতে হবে। এটা প্রামাণ্য অভিজ্ঞতা।' জ্বী, অভিযোগ সত্য। ছাত্ররা কিছুদিন ধরে খানা নষ্ট করছে। এতে পার্শ্ববর্তী জনসাধারণের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহর এ নির্দেশ আমরা বারবার পড়ছি- 'তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' তবুও আমরা অপচয় ছাড়তে পারছি না। উস্তাদজী কয়েকজন ছাত্রের নাম নিলেন। তারা উঠে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। এখন শিক্ষাগ্রহণের জন্য সকলের উপস্থিতিতে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আমার মনে একটি চিন্তার উদয় হল, আজ এরা মাত্র কয়েকশ ছাত্রের মাঝে অপরাধী হিসেবে দণ্ডায়মান! কিন্তু কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তো পৃথিবীর আওয়াল-আখের সব মানুষের সামনে দাঁড়াতে হবে, তখন আমাদের কী অবস্থা হবে? তবুও আমরা সতর্ক হবো না? অপচয় করেই যাবো! খানার অপচয়, সময়ের অপচয়, কথার অপচয়? আর কবে আমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে!?

মাহদী হাসান ত্রিশাল, মোমেনশাহী
জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।